আমি তপু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

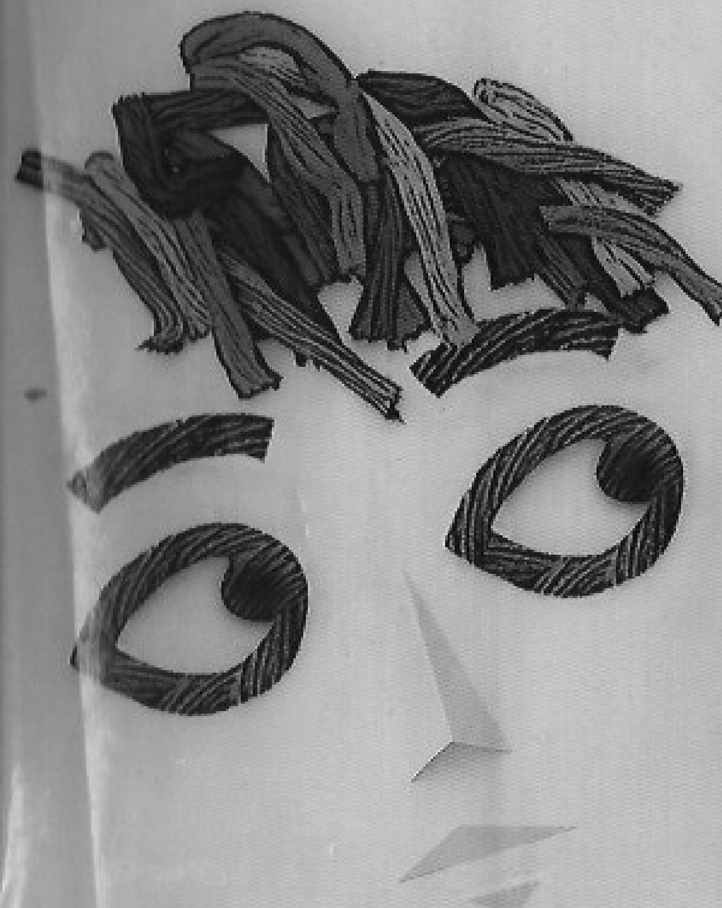

আমি তপু ● মুহম্মদ জাফর ইকবাল

B
IQBA

ISBN 984 495 139 9
9 789844 951395

একা একা

আমার নাম তপু। ভাল নাম আরিফুল ইসলাম। আমি বি.কে. সরকারি হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের ক্লাসে এখন আটচল্লিশজন ছেলে-মেয়ে, তার মাঝে আমার রোল নম্বর পঁয়তাল্লিশ। আমি বেশি লম্বা-চওড়া না, মোটামুটি ছোটখাটো সাইজ। আমার বয়স তেরো কিন্তু নিজের কাছে মনে হয় আমার বয়স বুঝি চল্লিশের কাছাকাছি। আমি জানি কেউ আমার কথা শুনলে একটুও বিশ্বাস করবে না, বলবে, ক্লাস এইটে পড়ে একটা ছেলের কাছে খামোখা নিজের বয়স চল্লিশ মনে হবে কেন? কিন্তু কথাটা সত্যি— আমি একটুও বাড়িয়ে বলি নাই। আমার আব্বু যখন গাড়ি একসিডেন্টে মারা গেলেন তখন আমার বয়স ছিল দশ, আমি তখন পড়ি ক্লাস ফাইভে। তারপর তিন বৎসর পার হয়েছে, এই তিন বৎসরে আমি তিন ক্লাস ওপরে উঠেছি। কিন্তু আব্বু মারা যাবার পর প্রত্যেকটা বৎসর আমার কাছে মনে হয়েছে দশ বৎসরের মতো লম্বা— একজন মানুষের দশ বৎসরে যে অভিজ্ঞতা হবার কথা আমার এক বৎসরেই সেই অভিজ্ঞতা হওয়া শুরু করল। তাই আমার সব সময় মনে হয় গত তিন বৎসরে আমার বয়স বেড়েছে তিরিশ বৎসর। সেই জন্যে বলছিলাম সব সময় আমার মনে হয় আমার বয়স প্রায় চল্লিশ। একজন চল্লিশ বছর বয়সের মানুষ যেভাবে চিন্তা করে আমিও মনে হয় সেইভাবে চিন্তা করি— অনেকটা বুড়ো মানুষের মতো। আমি যখন আসলেই বুড়ো হব তখন কী হবে কে জানে, তবে আমার মনে হয় সত্যি সত্যি বুড়ো হবার অনেক আগেই আমি মরে যাব।

কেন আমি এতো তাড়াতাড়ি বুড়ো মানুষের মতো হয়ে গেছি সেটা খুব বেশি মানুষ জানে না। যারা আমাকে বাইরে থেকে দেখে তাদের ধারণা আমার আব্বু মারা যাবার পর আমি বখে গিয়েছি। সেটা তারা ভাবতেই পারে, আমি তাদের একটুও দোষ দিই না। আগে আমি পড়াশোনায় অসম্ভব ভাল ছিলাম, শুধু যে পরীক্ষায়, ফার্স্ট হতাম তাই না, যে সেকেন্ড হতো সে কখনো আমার ধারে-কাছে আসতে পারত না। এখন আমার পরীক্ষায় পাস করা নিয়েই ঝামেলা—

আটচল্লিশজন ছেলেমেয়ের মাঝে কোনমতে টেনেটুনে আমি হয়েছি পঁয়তাল্লিশ নম্বর। আমার ধারণা সামনের বছর আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরও হতে পারব না, ক্লাস এইটেই আটকা পড়ে যাব। অঙ্ক ছাড়া আর কোন বিষয়ে আমি পাস করতে পারব না। আমি যে শুধু পড়াশোনাতে খারাপ হয়েছি তা না, আমার আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্র সবকিছু খারাপ হয়ে গেছে। আমি কারো সাথে ভাল করে কথা বলি না, খুব সহজে অন্যদের গালাগালি করতে পারি— ভয়ংকর ভয়ংকর খারাপ গালি আমি শিখে গেছি। শুধু যে গালাগালি করতে পারি তা না, মারামারিও করতে পারি। আমার গায়ে যে খুব জোর তা না- কিন্তু মারামারি করার জন্যে আসলে বেশি গায়ের জোর দরকার হয় না, যেটার দরকার সেটা হচ্ছে সাহস। সেটা আজকাল আমার ভালই হয়েছে— বড় ক্লাসের ছেলেদেরকেও আমি মাঝে মাঝে ধামকি-ধুমকি দিয়ে ফেলি। আমাদের ক্লাসের ভাল ছেলেরা আমার কাছেই আসে না, আর মেয়েদের কথা তো ছেড়েই দিলাম— আমি যদি কখনো তাদের চোখের দিকে তাকাই তাহলেই তারা মনে হয় ভয়ের চোটে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে।

আমি নোংরা কাপড় পরে স্কুলে আসি, চুল থাকে উষ্কখুষ্ক চেহারার মাঝে সবসময় একটা হতচ্ছাড়া ভাব থাকে, আমাকে দেখে আজকাল কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে আমি এক সময় স্কুলের নিখুঁত একটা ভাল ছেলে ছিলাম। কবিতা আবৃত্তি করতাম, ডিবেট করতাম, এমনকী স্কুলের বার্ষিক নাটকে আমি ছোট রাজপুত্রের অভিনয় করে একবার রুপার মেডেল পর্যন্ত পেয়েছিলাম। আমার বড় আপু কিংবা ভাইয়া এখনো নিখুঁত ভালো মেয়ে আর নিখুঁত ভালো ছেলে শুধু আমি অন্য রকম। আমার বড় আপুর নাম ঈশিতা, এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। শাড়ি পরে আপু যখন ইউনিভার্সিটিতে যায় তখন পাড়ার ইউনিভার্সিটি-কলেজে যাওয়া ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আর লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমার ভাইয়ার নাম রাজীব, সে যখন কলেজ থেকে এসে একটা টি শার্ট পরে ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে খেলতে বের হয় তখন কম বয়সী মেয়েরা চোখের কোণা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নিজেরা একজন আরেকজনের সাথে ফিসফিস করে কথা বলে খিলখিল করে হাসে। শুধু আমি অন্য রকম— আমার দিকে কেউ ঘুরে তাকায় না। যারা আমাদের ভাল করে চিনে না তাদের ধারণা আমার আম্মুর দুই ছেলে-মেয়ে, আপু আর ভাইয়া। আমি তাদের খুব দূর সম্পর্কের কোন গরিব হতভাগা আত্মীয়ের বখে যাওয়া ছেলে আর তারা দয়া করে আমাকে তাদের বাসায় থাকতে দিয়েছে। প্রথম প্রথম পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আপু আর ভাইয়া খুব অস্বস্তি বোধ করত, আজকাল করে না। অনেক দিন

হলো মেনে নিয়েছে— ধরেই নিয়েছে তারা হলো আমার আম্মুর সত্যিকারের ছেলে-মেয়ে আর আমি তাদের আপন ভাই হয়েও বাইরের একজন মানুষ।

এর শুরুটা ছিল খুব কষ্টের। আব্বু মারা যাবার পর প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেবার পর আমরা প্রথম যেদিন খেতে বসেছি তখন সবাই দেখেছি আম্মু কিছু খেতে পারছেন না। প্লেটের খাবার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। সেটা দেখে আমাদেরও চোখে পানি এসে গেলো, আব্বু যেই চেয়ারটায় খেতে বসতেন সেই চেয়ারটা আছে কিন্তু আব্বু নাই ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। আমিও নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। আম্মু তখন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তপু তুই কাঁদছিস কেন?"

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "আব্বুর কথা মনে পড়ছে আম্মু।"

আম্মুর চোখগুলো হঠাৎ কেমন যেন জ্বলে উঠল, কঠিন মুখে বললেন, "খবরদার, ঢং করবি না।"

আম্মুর কথা শুনে আমি এতো অবাক হলাম যে এক মুহূর্তের জন্যে কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম, আমি অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আম্মু চিৎকার করে বললেন, "বাপকে মেরে এসে এখানে বসে ঢং করিস? জানোয়ারের বাচ্চা।"

আম্মুকে দেখে হঠাৎ করে আমার কেমন যেন ভয় লাগতে থাকে, মনে হতে থাকে আমি তাকে চিনি না। আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট ছেলে, আব্বু আম্মু আপু ভাইয়া সবাই সবসময় আমার সাথে শুধু আহ্লাদি করেছে, আদর করেছে; ধমক দেয়া দূরে থাকুক কেউ কখনো গলা উঁচিয়ে কথা পর্যন্ত বলেনি। অথচ আম্মু এখন আমাকে জানোয়ারের বাচ্চা বলে গালি দিচ্ছে? বলছে আমি আমার আব্বুকে মেরে এসেছি?

খাবার টেবিলে আপু ভাইয়া আর আমি আম্মুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আপু বলল, "কী বলছ আম্মু?"

আম্মু চিৎকার করে বললেন, "ভুল বলেছি আমি? তোদের আব্বু কী এই বদমাইশটার জন্যে ক্রিকেট ব্যাট কিনতে গিয়ে মারা যায় নাই? ক্রিকেট ব্যাটের জন্যে কী ঘ্যান ঘ্যান করে এই জানোয়ারের বাচ্চা তোর আব্বুর জীবন নষ্ট করে দেয় নাই? যদি সেই রাতে ক্রিকেট ব্যাট কিনতে না যেত তাহলে কী মানুষটা এখন বেঁচে থাকত না?"

এটা সত্যি কথা, আমি কয়েক দিন থেকে আব্বুকে বলেছিলাম একটা ভাল দেখে ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিতে, আব্বু সেদিন অফিস থেকে এসে আমাকে

নিয়ে গিয়েছিলেন গুলশান মার্কেটে। ব্যাট কিনে ফিরে আসার সময় উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ি হঠাৎ করে ছুটে এসেছে তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। এরপর যখন জ্ঞান এসেছে দেখেছি আমি একটা ভাঙ্গা গাড়ির নিচে চাপা পড়ে থাকা একটা মানুষকে ধরে চিৎকার করছি। মানুষটা আমার আব্বু, কিন্তু রক্তে মাখামাখি হয়ে তাকে আর চেনা যায় না। আব্বু যদি সেদিন আমাকে নিয়ে ব্যাট কিনতে না যেতেন তাহলে সত্যিই হয়তো আব্বু বেঁচে থাকতেন।

আপু হাত দিয়ে আম্মুকে ধরে বলল, "কী বলছ আম্মু? তপুর কী দোষ? এইটা একটা একসিডেন্ট!"

"একসিডেন্ট?" আম্মু টেবিলে হাত দিয়ে থাবা দিয়ে বললেন, "তাহলে এই শয়তানের বাচ্চার কিছু হলো না কেন? তার গায়ে একটা আঁচড় লাগল না আর তার বাপ স্পট ডেড— এটা কীরকম একসিডেন্ট?"

আমি বিস্ফারিত চোখে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম আর মনে হতে লাগলো কেন আমি আব্বুর সাথে তখন তখনি মরে গেলাম না! আম্মু আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে বললেন, "শয়তানের বাচ্চা, দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে। দূর হয়ে যা এই মুহূর্তে, না হলে আমি তোকে খুন করে ফেলব!"

তারপর কিছু বোঝার আগে আম্মু আমার দিকে পানির গ্লাসটা ছুড়ে মারলেন, আমি মাথাটা সরানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু লাভ হল না। কাচের গ্লাসটা আমার কপালে এসে লাগলো। আমি ব্যথা পেলাম কীনা বুঝতে পারলাম না, ভয়ংকর একটা আতংক নিয়ে আমি আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আপু ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিয়ে গেলো, আমি তখনো থরথর করে কাঁপছি। আপু আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, বলছে, "সব ঠিক হয়ে যাবে তপু। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি ভাঙ্গা গলায় বললাম, "আপু, আম্মু এরকম করছে কেন?"

"খুব বড় শক পেয়েছে তো।"

"আমার ভয় লাগছে আপু, অনেক ভয় লাগছে।"

"ভয়ের কিছু নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে তপু। দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু আসলে সব ঠিক হয়ে যায় নি। প্রথম রাত আমি সারারাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছি, আমার মনে হয়েছে হয়তো রাত্রিবেলা আম্মু আমার কাছে আসবেন। আগের মতো আমাকে বুকে চেপে ধরে বলবেন, "তপু সোনা

আমার। রাগ করিস না আমার ওপর বাবা, মাথার ঠিক নেই, কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলেছি।" কিন্তু আম্মু রাত্রিবেলা আমার কাছে এলেন না। শুধু যে সেই রাত্রে এলেন না তা না, কোন রাত্রিতেই এলেন না। আমি সারাক্ষণই অপেক্ষা করে থাকতাম যে কখন আম্মু আমার সাথে একটু নরম স্বরে কথা বলবেন, কখন এসে একটু আদর করবেন। কিন্তু আম্মু আদর করা বা নরম সুরে কথা বলা দূরে থাকুক আমার দিকে ভাল করে তাকালেনই না। শেষে আর কোন উপায় না দেখে একদিন গভীর রাতে আমি নিজেই আম্মুর কাছে গিয়েছি। আম্মু ঘুমাচ্ছিলেন, আমি আস্তে আস্তে ডাকলাম, "আম্মু।"

আম্মু ঘোরের মাঝে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "কে?"

"আমি তপু।"

তখন আম্মু চোখ খুলে তাকালেন, বারান্দার আলো ঘরে এসে পড়েছে। সেই আলোতে আম্মু আমাকে দেখলেন। আমি মশারি তুলে আম্মুকে ধরার চেষ্টা করলাম, আম্মু কেমন যেন ছিটকে সরে গেলেন, তীব্র স্বরে বললেন, "কী হয়েছে?"

আমি আর পারলাম না, ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম, বললাম, "তুমি কেন আর আমাকে আদর করো না?"

আম্মু কেমন যেন হিংস্র গলায় বললেন, "আদর করব? আমি? তোকে? কেন তোকে আদর করব? তুই কে? নিজের বাপকে খুন করে তুই এখন আমার কাছে এসেছিস?"

আমার মনে হতে লাগলো সমস্ত দুনিয়াটা আমার চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে, তবু আমি শেষবার চেষ্টা করলাম, বললাম, "আম্মু! আমি তো কিছু করি নাই! আব্বু তো একসিডেন্টে মারা গেছেন।"

"তুই কেন একসিডেন্টে মারা গেলি না?"

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "তুমি চাও আমিও একসিডেন্টে মারা যাই?"

আম্মু চাপা গলায় বললেন, "হ্যাঁ। আমি চাই। তুই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। আর কোন দিন তুই আমার সামনে আসবি না!"

"কোন দিন আসব না?"

"না।"

বারান্দা থেকে আসা আবছা আলোতে আমি কিছুক্ষণ আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলাম, হঠাৎ করে আমার মনে হলো আমার বয়স বুঝি অনেক বেড়ে গেছে। মনে হলো আমি আর ছোট বাচ্চা নই, মনে হলো আমি অনেক বড় একজন

মানুষ। আমি বুঝতে পারলাম এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, আমি একেবারে একা। আমি যদি বেঁচে থাকতে চাই আমার একা বেঁচে থাকতে হবে, যদি বড় হতে চাই তাহলে একা বড় হতে হবে। আমার চোখের পানি হঠাৎ করে শুকিয়ে গেল, আমি বুঝতে পারলাম যার চোখের পানির কোন মূল্য নেই এই পৃথিবীতে তার থেকে হতভাগা আর কেউ নেই। আমি আর একটি কথা না বলে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

আমি সারারাত জানালার রড ধরে বসে ছিলাম। আব্বু মারা যাবার পর আমার বুকটা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আমার বুকের ভেতর যে কষ্ট জমা হয়েছে সেটা কখনো কাউকে বলে বুঝাতে পারব না। নিজের ভেতর গভীর একটা অভিমান হলো, আম্মুর ওপর অভিমান, পৃথিবীর ওপর অভিমান, এমনকী আমাদেরকে ছেড়ে এতো তাড়াতাড়ি মরে যাবার জন্যে আব্বুর ওপর অভিমান। আমি রাতের বেলা জানালার রড ধরে বসে থাকতে থাকতে ঠিক করলাম আমি আত্মহত্যা করব।

আমি অবশ্যি আত্মহত্যা করতে পারি নি। আত্মহত্যা করার জন্যে মনে হয় অনেক সাহসের দরকার, দশ বছরের ছোট একটা ছেলের আসলে এত সাহস থাকে না। আমি আত্মহত্যা করার জন্যে অনেক দিন ওভার ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকতাম, একটা বাস বা ট্রাক যাবার সময় আমি মনে মনে ঠিক করতাম যে এখন আমি লাফিয়ে পড়ব কিন্তু কখনোই শেষ পর্যন্ত লাফিয়ে পড়তে পারি নি। আত্মহত্যা না করলেও আত্মহত্যা করে যখন ইচ্ছা তখন সবকিছু শেষ করে দিতে পারব– এই চিন্তাটা আমার ভেতরে খানিকটা ভরসা এনে দিল আর এই ভরসাটার কারণেই আমি একদিন একদিন করে বেঁচে থাকতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে বাসায় আমার অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে গেলো। আম্মু এমনিতে ভাল মানুষ, আব্বুর অফিসে তাকে বেশ ভাল একটা চাকরি দিয়েছে। অফিসের গাড়ি এসে আম্মুকে নিয়ে যায় আবার বিকেলে আম্মুকে বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আম্মু সারাদিন স্বাভাবিকভাবে অফিস করেন, কেউ কিছু বুঝতে পারে না। বাসাতে এসেও হাসিখুশি থাকেন কিন্তু আমাকে দেখলেই হঠাৎ করে খেপে যান, কেউ তাকে থামাতে পারে না। কোন উপায় না দেখে আপু আর ভাইয়া মিলে আমাকে আম্মুর চোখের সামনে থেকে আড়াল করে রাখতে শুরু করল। খাবার টেবিলেও আমি যাই না। আম্মু আপু আর ভাইয়াকে নিয়ে খান– আমি খাই আলাদা। আগে নিয়ম ছিল সন্ধে হবার আগে সবাইকে বাসায় ফিরে আসতে হবে এখন সেই নিয়মটা শুধু আপু আর ভাইয়ার জন্যে, আমি বাসায়

এসেছি কী আসি নি কেউ সেটা জানতে চায় না। একদিন আম্মুর নতুন অফিস থেকে একজন আমাদের বাসায় বেড়াতে এলো, আম্মু তাকে বললেন তার দুইজন ছেলে-মেয়ে; তারপর ভাইয়া আর আপুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কেউ কেউ মনে করতে পারে আমি যে আছি সেটা আম্মু ভুলে গেছেন। কিন্তু সেটা সত্যি নয়, আম্মু আসলে সেটা একবারও ভুলতে পারেন না। যখন আস্তে আস্তে নিয়ম হয়ে গেলো আম্মু আপু আর ভাইয়াকে নিয়ে খাবে আর আমি খাব আলাদা তখন আমার খাবারটাও অন্যরকম হয়ে গেল। আম্মু খাওয়া শেষ করে দুলি খালাকে দিয়ে সব খাবার ফ্রিজে তুলে রাখতেন যেন আমি সেটা খেতে না পারি। দুলি খালা আমার জন্যে সেখান, থকে খাবার গরম করতে চাইলে আম্মু রেগে আগুন হয়ে যেতেন– দুলি খালা এতোদিন থেকে আমাদের বাসায় আছেন, তাকে পর্যন্ত আম্মু একেবারে অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করতেন।

আস্তে আস্তে আমি দুলি খালার সাথে রান্নাঘরে বসে খেতে শুরু করলাম। মোটা চালের ভাত, কোন একটা ভর্তা, বাসি ডাল এই ধরনের খাবার। দুলি খালা কখনো লুকিয়ে একটা ডিম ভাজা করে দিতো, রান্না করার সময় হয়তো আমার জন্যে একটু খাবার লুকিয়ে রাখতো– কখনো সেগুলো দিতো। আমি যখন খেতাম তখন দুলি খালা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তো আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। আমি যে সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে ফেলি নি দুলি খালা তার একটা কারণ। আপু আর ভাইয়া আমার জন্যে যেটা করতে পারে নি দুলি খালা সেটা করেছিল, সে আমাকে বেঁচে থাকার জন্যে সাহস দিয়েছিল। আমি যখন খেতাম তখন আমার পাশে বসে ফিসফিস করে বলতো, "শোন বাবা তপু। তোমার ওপরে কিন্তু খুব বড় বিপদ। তোমার মা তোমারে আদর করে না সেইটা সত্যি না। সন্তান হইল মায়ের শরীলের অংশ। সন্তান চোর ডাকাইত বদমাইশ যাই হোক মা তারে ভালবাসে। যদি কখনো কুনো মা তার সন্তানরে ভাল না বাসে তাইহলে তার অর্থ কী জানো?"

আমি জিজ্ঞেস করতাম, "কী?"

দুলি খালা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলতো, "তার অর্থ তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তোমার মা অসুস্থ। তোমার মা পাগলি। তোমার বাপ মরে যাবার পর তার মাথাটা পুরাপুরি আউলে গেছে। অন্য কেউ বুঝতে পারে না, আমি পারি। চোখ দেখলেই বুঝতে পারি।"

"কেন? চোখে কী হয়েছে?"

"চোখগুলি জ্বলে তুমি দেখ নাই? তুমি খুব সাবধান বাবা– আমার কেন জানি মনে হয় কোন একদিন তোমার মা তোমারে খুন করে ফেলার চেষ্টা করবে।"

শুনে আমার শরীর কেঁপে উঠলো। দুলি খালা তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলতো, "তোমার বাপ মরে যাবার পর তোমাদের এই সংসারটা ছারখার হয়ে গেছে। এইখানে আমার মন টিকে না বাবা। একেবারে ভাল লাগে না। তবু আমি এইখানে আছি– কেন আছি জানো?"

"কেন দুলি খালা?"

"তোমার জন্যে। খালি তোমার জন্যে। তোমার ভাই আর বইন তোমারে রক্ষা করতে পারবে না। আমি না থাকলে তুমি না খায়া মারা যাইবা। বুঝেছ?"

আমি মাথা নাড়ি। দুলি খালা বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তোমার মায়ের উপর কুনো রাগ রাইখ না বাবা। তোমার মা আসলে পুরাপুরি পাগল। সে কী করতাছে সে জানে না। তারে আসলে পাগলাগারদে রাখা দরকার। তার চিকিৎসা হওনের দরকার। তারে তাবিজ-কবজ দেওয়া দরকার–"

দুলি খালাই আসলে সত্যিকার ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল, আস্তে আস্তে আমি নিজেই বুঝতে পেরেছিলাম আব্বু মারা যাবার পর সত্যি সত্যি আমার আম্মুর মাথার ভিতরে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। তার চিকিৎসা করানোর দরকার ছিল, কিন্তু আমাকে সহ্য করতে না পারা ছাড়া আর কোন সমস্যা ছিল না দেখে সেটা বাইরের কেউ কোন দিন বুঝতে পারে নি। দুলি খালা বলেছিল আম্মু আমাকে খুন করে ফেলতে পারে, আমি সেটা কখনো বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন একেবারে অকারণে রেগে উঠে আম্মু আমার মাথা বালতির পানিতে চেপে ধরেছিলেন। দুলি খালা রীতিমতো ধস্তাধস্তি করে আমাকে ছুটিয়ে না আনলে হয়তো সেদিন মরেই যেতাম। সেই থেকে আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি। আম্মু যদি বাসায় একা থাকেন আমি বাসার ভিতরেই ঢুকি না। যতদিন আব্বু বেঁচে ছিলেন গায়ে হাত তোলা দূরে থাকুক কেউ আমার সাথে গলা উঁচু করেও কথা বলে নি। এখন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, একেবারে অকারণে আম্মু আমাকে মারধর করেন। ছোটখাটো চড়-থাপ্পড় নয় একেবারে অমানুষিক মার। প্রথম প্রথম আপু, ভাইয়া কিংবা দুলি খালা আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতো কিন্তু তাহলে আম্মু আরো রেগে যান বলে আজকাল আর কেউ চেষ্টা করে না। আমি দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করতে শিখে গেছি। মার খাওয়ার যন্ত্রণাটুকু নয় এর পিছনের নিষ্ঠুরতাটুকু আমাকে অনেক বেশি কষ্ট দেয়।

কয়দিনের ভিতরেই আমি রান্নাঘরে স্টোররুমে ঘুমানো শুরু করলাম। আমার পরিচিত মানুষেরা এটা শুনলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হতো কিন্তু ততদিনে আমার বাসার সবাই এটা মেনে নিয়েছে। আমি যদি আগের মতো ভাইয়ার ঘরে

ঘুমাই তাহলে প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই আম্মুর কোন একরকম অত্যাচার সহ্য করতে হয়। আম্মু এমনিতে ভাল মানুষ শুধু আমাকে দেখলেই খেপে যান। তাই সমস্যাটার সবচেয়ে ভাল সমাধান হচ্ছে যেন কোন সময়েই আমাকে দেখতে না পান। বাসায় এসে আমি তাই রান্নাঘরের স্টোররুমে ঢুকে যেতাম। চালের বস্তা, আলুর টুকরি, তেল-পেঁয়াজ সরিয়ে দুলি খালা আমাকে শোয়ার একটা জায়গা করে দিল। আমি রাত্রেবেলা সেখানে ঘুমাতাম। বাসার সবাই বিষয়টা জানতো কিন্তু এমন ভান করতো যেন জানে না। আপু আর ভাইয়া যখন আমার দিকে তাকাতো আমি বুঝতে পারতাম আমার জন্যে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না। আমি আস্তে আস্তে আবিষ্কার করলাম এক সময়ে তারাও পুরো ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলো, ধরেই নিল আমি রান্নাঘরের স্টোররুমে চালের বস্তার পাশে আলু বেগুন পেঁয়াজ আর রসুনের পাশে গুটিশুটি মেরে ঘুমাব। আগে পড়াশোনার একটা ব্যাপার ছিল এখন সেটাও নাই, খাতা কলম বইপত্র না থাকলে মানুষ পড়াশোনা করে কেমন করে? ধীরে ধীরে পড়াশোনাটাও প্রায় বন্ধ হতে শুরু করল। স্কুলের ছেলেমেয়েরা আর স্যার-ম্যাডামেরা ধরে নিলো আব্বু মারা যাবার পর আমি আস্তে আস্তে বখে যেতে শুরু করেছি। আমার শরীরে আম্মুর মারের যেসব চিহ্ন থাকতো সবাই ধরে নিতে শুরু করল সেগুলো এসেছে মারামারি করে! আস্তে আস্তে সবাই আমাকে ভয় পেতে শুরু করলো। আমার দুই চারজন যে বন্ধুবান্ধব ছিল তারাও আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে শুরু করল।

আমি হয়ে গেলাম একা। একেবারে একা।

প্রিয়াংকা

এরকম সময়ে আমি ঠিক করলাম আমি বাসা থেকে পালিয়ে যাব। আগেই করা উচিত ছিল, কেন করি নাই সেটা ভেবেই আমার অবাক লাগল। আত্মহত্যা করার বিষয়টা অনেকবার চিন্তা করেছি কিন্তু বাসা থেকে পালানোর কথা একেবারেই চিন্তা করি নাই। আত্মহত্যা করার সাহস হয় নাই কিন্তু বাসা থেকে পালানোর বিষয়টা আমার কাছে খুব সহজ মনে হতে লাগলো। রান্নাঘরের স্টোররুমে তেলাপোকা আর ইঁদুরের মাঝখানে আমি যদি ঘুমাতে পারি তাহলে রাস্তাঘাটে-ফুটপাথে কিংবা রেল স্টেশনে ঘুমাতে অসুবিধা হবে কেন? আমি কল্পনা করতে শুরু করলাম সবাইকে ছেড়েছুড়ে বহুদূরে কোথাও চলে গেছি— কোন পাহাড়ের কাছে কিংবা সমুদ্রের তীরে। একা একা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ আমাকে কিছু বলছে না, ঘেন্না করছে না, বকাবকি করছে না, মারধর করছে না। বহুদিন আগে যখন আমি টেলিভিশন দেখতে পারতাম তখন টেলিভিশনে একবার বেদেদের ওপরে একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম, তারা সবাই মিলে নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। নৌকায় তাদের ঘরবাড়ি, নৌকায় তাদের সংসার, নৌকায় তাদের সবকিছু। খুঁজে খুঁজে এরকম বেদে নৌকা খুঁজে বের করে তাদের সাথে চলে যাব। আমিও বেদে হয়ে যাব।

বাসা থেকে পালিয়ে যাবার শুধু একটা সমস্যা- সেটা খুব ভাবনাচিন্তা করে করা যায় না। কাজেই আমি ঠিক করলাম কোন একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসা থেকে বের হয়ে যাব আর ফিরে আসব না। আমি মোটামুটি নিশ্চিত আমি বাসায় ফিরে আসি নাই বাসার কেউ সেটা অনেক দিন জানবে না। হয়তো দুলি খালা সেটা প্রথমে লক্ষ্য করবে, বাসায় বলার চেষ্টা করবে কিন্তু আম্মু শুনতে চাইবেন না। আম্মু যেহেতু শুনতে চাইবেন না তাই আপু আর ভাইয়াও কিছু করতে পারবে না, নিজেরা নিজেরা হয়তো এখানে সেখানে একটু খোঁজখবর নেবে তারপর হাল ছেড়ে দেবে। কয়দিন পরে আস্তে আস্তে সবাই ভুলে যাবে। আগে হলে এই পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার ভয়ংকর একটা অভিমান হতো, আজকাল কিছুই হয় না। মানুষের ভেতর ভাল ভাল যেসব অনুভূতিগুলি

থাকে আমার সেগুলি শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে। নিজের ভিতরে সেগুলি শেষ হয়ে গেছে বলে অন্যের ভেতরে সেগুলো থাকতে পারে সেটাও আমার আর বিশ্বাস হয় না। যাকেই দেখি তাকেই মনে হয় নিষ্ঠুর।

যেদিন বাসা থেকে পালাব ঠিক করলাম সেদিন একটু সকাল সকাল বের হয়েছি, সরাসরি রেল স্টেশনে গিয়ে কোন একটা ট্রেনের ছাদে গিয়ে বসব ঠিক করেছিলাম কিন্তু খানিক দূর গিয়ে মনে হলো শেষবারের মতো একবার স্কুল থেকে ঘুরে আসি। কেন সেটা মনে হলো কে জানে! একজন মানুষের জীবনে একটা ছোট ঘটনা সবকিছু ওলটপালট করে দেয়- আমার সেদিনের স্কুলে যাবার ঘটনাটা ছিল সেরকম একটা ঘটনা, আমার জীবনের সবকিছু সেই ঘটনার জন্যে অন্যরকম হয়ে গেল।

ক্লাসরুমে জানালার কাছাকাছি একটা সিট আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা আছে, সেখানে কেউ বসতে সাহস পায় না। আমাদের ক্লাসের ছেলেরা আর মেয়েরা একে অন্যের সাথে মিশে না, মেয়েরা সামনে কয়েকটা বেঞ্চে বসে, ছেলেরা বসে পিছনে। ছেলেরা পিছনে বসলেও শুধু যে আমার সিটে কেউ বসে না তা নয়, আমার পাশেও বসতে চায় না। কিন্তু সেদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি আমার সিটে একজন বসে আছে। কোন একজন ডানপিটে ধরনের বা গাধা টাইপের ছেলে হলে কথা ছিল- যে বসে আছে সে একটা মেয়ে। নতুন এসেছে বলে কিছু জানে না। আমাদের ক্লাসের মেয়েগুলো অহংকারী ধরনের, কখনো হাসে না, সবসময় মুখ গম্ভীর করে থাকে। দেখলেই মনে হয় কেউ বুঝি তাদের আচ্ছা করে বকাবকি করেছে কিংবা ধরে জোর করে তেতো কোন ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে, সেই জন্যে মুখগুলো এরকম ভোঁতা! তবে এই মেয়েটা তাদের মতো না, সম্পূর্ণ অন্যরকম। মেয়েটার চোখে-মুখে হাসি, চোখগুলো কেমন যেন চকচক করছে। পিছনের ডেস্কে হেলান দিয়ে বসে এমনভাবে পা দুলাচ্ছে যে দেখে মনে হবে তার বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে। মেয়েটার আহ্লাদি ভাব দেখেই আমার মেজাজ একটু গরম হয়ে গেলো। আমি কাছাকাছি গিয়ে বললাম, "সরো।"

মেয়েটা পা দোলানো বন্ধ করে বলল, "কোথায় সরব?"

আমি মেঘের মতো গলায় বললাম, "মেয়েরা সামনে বসে। ছেলেদের সাথে বসে না।"

মেয়েটার হাসি হাসি মুখ এবারে একটু গম্ভীর হলো। বলল, "ছেলেদের সাথে বসলে কী হয়?"

আমি এখন তার সাথে একটা আলোচনা শুরু করে দেব সেটা তো হতে পারে না, তাই মুখ খিঁচিয়ে একটা ধমক দিয়ে বললাম, "খবরদার বলছি, ভ্যাদর ভ্যাদর করবে না। তোমাকে সরতে বলেছি সরো।"

ক্লাসের অন্য যে কোন মেয়ে হলে আমার এই ধমক খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতো, কিন্তু এই মেয়ের কিছু হলো না। আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি খুব একটা মজার কথা বলেছি। তার মুখে হাসি হাসি ভাবটা ফিরে এলো এবং আবার সে পা দোলাতে শুরু করল। আমি আবার হুংকার দিলাম, "কী হলো কথা কানে যায় না?"

আমার ধমক শুনে ক্লাসের অন্য সবাই ঘুরে তাকিয়েছে, সোজাসুজি তাকাতে সাহস পাচ্ছে না তাই চোখের কোণা দিয়ে আমাকে দেখার চেষ্টা করছে। আমার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেলো, আমি আবার মুখ-চোখ খিঁচিয়ে হাত নেড়ে হুংকার দিয়ে বললাম, "এটা আমার সিট, এখান থেকে সরো।"

আমি যখন এভাবে মুখ-চোখ খিঁচিয়ে হুংকার দিয়ে কথা বলি তখন কেউ আমার দিকে তাকাতেই সাহস পায় না কিন্তু এই মেয়ে একেবারে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, চোখে ভয়-ডর তো নেই-ই উল্টো মনে হলো কৌতুক। যেন আমি হাসির একটা নাটক করছি আর সে সেই নাটকটা খুব উপভোগ করছে। আমি টেবিলে থাবা দিয়ে আরেকটা ধমক দিতে যাচ্ছিলাম তখন মেয়েটা বলল, "ঠিক আছে, আমি তোমাকে তোমার সিটে বসতে দেব কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"তুমি এরকম রাগ হয়ে কথা বলতে পারবে না। তোমাকে সুইট করে কথা বলতে হবে!"

আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম। মেয়েটার নিশ্চয়ই পুরোপুরি মাথা খারাপ তা না হলে কেউ এভাবে কথা বলে? মেয়েটা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলো, "তুমি বলো, 'প্লি-ই-জ তুমি এখান থেকে সরে বসো', তাহলে আমি তোমাকে তোমার সিট ছেড়ে দেব।"

মেয়েটার কথার মাঝে কী ছিল কে জানে, আমাদের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের অনেকেই হি হি করে হেসে উঠল। আমাকে নিয়ে কেউ হাসলে আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না, আমার মাথায় একেবারে রক্ত চড়ে গেল। আমি তখন ডেস্কের ওপর রাখা মেয়েটার খাতা বই ব্যাগ টান দিয়ে ছুড়ে নিচে ফেলে দিয়ে বললাম, "আমার সাথে ঢং করো? ঢং করো আমার সাথে?"

মেয়েটা এবারে একটু অবাক হয়ে তাকালো, মাথা নেড়ে বলল, "আমি আজকে প্রথম দিন তোমাদের স্কুলে এসেছি আর তুমি আমার সাথে এরকম ব্যবহার করলে?" মেয়েটা নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু অপেক্ষা করে বলল, "আমি মনে খুব কষ্ট পেলাম।"

মানুষ যে সুন্দর করে বা ভাল করে কথা বলতে পারে আমি সেটা ভুলেই গেছি। আমার সাথে কেউ ভাল ব্যবহার করে না, আমিও করলাম না। বললাম, "মেয়ে বলে বেঁচে গেলে। ছেলে হলে এমন ছ্যাঁচা দিতাম যে তখন খালি মনে না শরীরের গিটটুতে গিটটুতেও কষ্ট পেতে!"

মেয়েটা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আমি তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে এলাম। বের হওয়ার সময় লক্ষ করলাম ক্লাসের বেশ কয়েকটা ছেলেমেয়ে মেয়েটার কাছে ছুটে গেলো, নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে খোঁজখবর দিয়ে সাবধান করে দেবে। ক্লাসে ফিরে আসার পর মেয়েটা যে আমার থেকে দূরে নিরাপদ একটা জায়গায় বসবে সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। ক্লাস শুরু হতে এখনো দেরি আছে। আমি ততক্ষণ স্কুলের বাউন্ডারি ওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে চারপাশের সবকিছু দেখে সময় কাটাই। আমার কোন বন্ধু নাই, কোন আপনজন নাই– আমি সব সময় একা একা থাকি।

ঘণ্টা পড়ার পর ক্লাসে ফিরে এসে দেখলাম মেয়েটা আমার জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে বসেছে। কিন্তু পুরোপুরি সরে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় বসে নি। আমাকে দেখে খুব মনোযোগ দিয়ে আমাকে লক্ষ করল কিন্তু কিছু বলল না। আমি সরাসরি তার দিকে তাকালাম না, তাই বুঝতে পারলাম না তার চোখের দৃষ্টিতে ভয় বা ঘেন্না কোনটা আছে। ঘেন্না থাকাটাই স্বাভাবিক– আজকাল কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

প্রথম পিরিয়ডে বাংলা। বাংলা স্যারের নাম তোফাজ্জল হোসেন সরকার ছেলেরা ডাকে তোফাজ্জল হোসেন রাজাকার— সংক্ষেপে রাজাকার স্যার। এই নামের পিছনে একটা কারণ আছে, স্যারের ধারণা মুক্তিযুদ্ধের পুরো ব্যাপারটা ভুয়া, ইন্ডিয়া যুদ্ধ করে দেশটা দখল করে ফেলেছে। ক্লাসেও সেটা আকারে ইঙ্গিতে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। বাংলা বইয়ে বীরশ্রেষ্ঠদের গল্প পড়ার সময় স্যার ফ্যাক ফ্যাক করে হাসেন যেন পুরো বিষয়টা একটা তামাশা। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো ক্লাসে পড়ান না, কেউ সেটা নিয়ে প্রশ্ন করারও সাহস পায় না। বাংলাদেশের সাথে যখন পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হয় তখনও এই স্যার বাংলাদেশকে সাপোর্ট না করে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেন।

ঘণ্টা পড়ার কিছুক্ষণ পর তোফাজ্জল হোসেন সরকার খাতাপত্র নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। ঢুকে সবসময় স্যার সারা ক্লাসে একবার চোখ বুলিয়ে নেন, আজকেও চোখ বুলালেন এবং আমার পাশে এই নতুন মেয়েটিকে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলেন। খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তু-তুমি এখানে কেন?"

মেয়েটা বলল, "আমি নতুন এসেছি স্যার।"

মেয়েটা নতুন এসেছে, যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে মাথায় একটু পাগলামোর ধাচ আছে তাই স্যারের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না। স্যার আসলে জানতে চাচ্ছিলেন সে মেয়ে হয়ে ছেলেদের সাথে কেন বসেছে। স্যার রাজাকার টাইপের মানুষ, কোন ছেলে আর মেয়েকে কথা বলতে দেখলেই খুব বিরক্ত হন— ক্লাসে পাশাপাশি বসতে দেখলে তার তো মেজাজ খারাপ হতেই পারে। স্যার বললেন, "নতুন এসেছ তো বুঝতেই পারছি। তা পিছনে বসেছ কেন? সামনে আস।"

ইঙ্গিতটা একেবারে স্পষ্ট, মেয়ে হয়ে ছেলেদের সাথে পিছনে বসেছ কেন, সামনে চলে এসো। মেয়েটা ইঙ্গিতটা হয় বুঝতে পারল না কিংবা না বোঝার ভান করল, ফিক করে একটু হেসে ফেলে বলল, "না স্যার। পিছনেই ভাল। আমি সব সময় পিছনে বসি।"

স্যার বললেন, "পি-পিছনে বসে?"

"জি স্যার।"

"কেন?"

"পিছনে বসলে সবাইকে দেখা যায়। খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়।"

আমাদের রাজাকার স্যার মনে হয় কিছুই বুঝতে পারলেন না, খানিকক্ষণ মুখ হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঢোক গিলে বললেন, "ইন্টারেস্টিং?"

"জি স্যার।"

আস্তে আস্তে তার মুখটা মেঘের মতো কালো হলো, স্যার ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি স্কুলে কী পড়াশোনা করতে এসেছ না ইন্টারেস্টিং কাজ করতে এসেছ?"

মেয়েটার চেহারায় একটা হাবা হাবা ভাব আছে কিন্তু মেয়েটা অসম্ভব চালু, স্যারের প্রশ্নের উত্তরে একটুও চিন্তা না করে সাথে সাথে বলল, "ইন্টারেস্টিং উপায়ে পড়াশোনা করতে এসেছি স্যার।"

মেয়েটার কথা শুনে ক্লাসের অনেকে খিকখিক করে হেসে ফেলল, স্যার তখন আরো রেগে গেলেন, ধমক দিয়ে বললেন, "চোপ, সবাই চোপ।"

সবাই চুপ করে যাবার পর স্যার তার রেজিস্টার খাতা খুলে গম্ভীর গলায় রোল নম্বর ডাকতে শুরু করলেন। নতুন মেয়েটার রোল নম্বর বাহান্ন, নাম প্রিয়াংকা।

রোল কল শেষ করে স্যার পড়াতে শুরু করলেন। ক্লাসের শুরুতেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তাই আজকে আমাদের কপালে দুঃখ আছে। স্যার বই দেখে একটা প্যারাগ্রাফ শেষ করেই জয়ন্তকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। জয়ন্ত ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র, উত্তরটা ঠিকভাবে দিয়ে দিল, স্যার মনে হলো তখন আরেকটু রেগে গেলেন। আমরা ভাবলাম জয়ন্তকে আরো কঠিন একটা প্রশ্ন করবেন। জয়ন্তকে পড়াশোনার প্রশ্ন করে আটকানো খুব কঠিন, তবে রাজাকার স্যারের অসাধ্য কিছু নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত জয়ন্ত একটা ভুল উত্তর না দিচ্ছে স্যার প্রশ্ন করে যেতেই থাকবেন এবং তখন তাকে আচ্ছা মতন পেটাবেন— স্যার প্রায় সব ক্লাসেই হিন্দু ছেলেদের পেটান। কিন্তু আজকে জয়ন্তের কপাল ভাল, স্যার জয়ন্তকে ছেড়ে দিলীপকে ধরলেন। দিলীপের পড়াশোনায় একেবারে মন নেই, ক্লাসে এসে উদাস মুখে বসে থাকে। সে কী বুদ্ধিমান না বোকা সেটা আমরা এখনও ঠিকভাবে ধরতে পারি নাই। স্যারেরা কিছু জিজ্ঞেস করলে প্রশ্ন শেষ হবার আগেই মাথা নেড়ে বলে, "জানি না স্যার।"

আজকেও তাই হলো, সাথে সাথে রাজাকার স্যার এসে খপ করে দিলীপের চুলের মুঠি ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে পেটাতে শুরু করলেন। স্যারের মনে কোন দয়ামায়া নেই, একেবারে পশুর মতো পেটাতে পারেন আজকে মনে হয় রাগটা আরেকটু বেশি, ধরেই যেভাবে মারতে শুরু করলেন তার কোন তুলনা নেই।

ঠিক তখন একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল, যার জন্যে রাজাকার স্যার দূরে থাকুক আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। আমার পাশে বসে থাকা মেয়েটা তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে, "না স্যার, না স্যার" বলে চিৎকার করতে করতে ক্লাসের সামনে ছুটে গেল। স্যার কিছু বোঝার আগেই সে দিলীপকে ধরে স্যারের হাত থেকে ছুটিয়ে নেয়। দিলীপের সামনে দাঁড়িয়ে সে মাথা নেড়ে বলে, "না স্যার, প্লিজ। আপনি মারবেন না।"

স্যারের কয়েক সেকেন্ড লাগল বুঝতে কী হচ্ছে, যখন বুঝতে পারলেন তখন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে স্যারের মুখ রাগে বিকৃত

হয়ে গেলো, কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর চিৎকার করে বললেন, "সরে যাও আমার সামনে থেকে বেয়াদব মেয়ে।"

এতো বড় ধমক খেয়েও মেয়েটার এতটুকু ভাবান্তর হলো না, বরং মনে হলো তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। মুখটা হাসি হাসি রেখেই অনুনয়ের গলায় বলল, "না স্যার। প্লিজ। আমি স্যার এই ক্লাসে নতুন এসেছি– ক্লাসের সবাই আমার বন্ধু। একজন বন্ধুর সামনে আরেকজন বন্ধুকে মারলে তার খুব লজ্জা হয় স্যার। প্লিজ স্যার– লজ্জা দেবেন না স্যার।"

"লজ্জা? লজ্জা হয়?" স্যার দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "আমার সাথে তুই মশকরা করিস? এইখানে কারো ভিতরে কোন লজ্জা-শরম আছে? যতো সব বেহায়া-বেয়াদব বেজন্মার দল–"

রাজাকার স্যারের এতো বড় হুংকারের মাঝেও মেয়েটা ঘাবড়ালো না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "না স্যার, লজ্জা আছে। আমাদের সবার ভেতরে লজ্জা আছে। আমাদের মারলে ব্যথাটা সহ্য করতে পারি, কিন্তু স্যার লজ্জাটা সহ্য করতে পারি না–"

আমি এইবারে নড়েচড়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সত্যিই তো, আমার আব্বু যখন আমাকে নির্দয়ভাবে মারেন একটু পরেই আর ব্যথার অনুভূতিটা থাকে না। তখন শুধু থাকে লজ্জা আর অপমান। এই মেয়েটা তো সত্যি কথাই বলছে। আমরা ছোট হতে পারি তাই বলে আমাদের মান-অপমান নেই, লজ্জা নেই— সেটা তো সত্যি নয়। এই প্রথমবার পাগলাটে ধরনের নতুন মেয়েটাকে আমি একটু গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করলাম। হালকা-পাতলা শ্যামলা একটা মেয়ে। ছোট ছোট করে চুল কেটেছে, অনেকটা প্রায় ছেলেদের মতো, চোখে-মুখে এক ধরনের তীব্র অনুভূতির ছাপ, দেখে মনে হচ্ছে দিলীপকে রাজাকার স্যারের হাত থেকে রক্ষা করাটাই বুঝি তার জীবনের সবকিছু। যাকে রক্ষা করার জন্যে মেয়েটা এতো বড় একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে সেই দিলীপকে কিন্তু মোটেও বিচলিত দেখা গেলো না। সে মোটামুটি উদাস উদাস মুখে পুরো ব্যাপারটা নির্লিপ্তভাবে দেখছে, দেখে মনে হচ্ছে এখানে কী হচ্ছে তাতে তার কিছু আসে যায় না।

রাজাকার স্যার কেমন যেন বিস্ফারিত চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেউ যদি স্যারকে না চিনে তাহলে তার কাছে স্যারের চেহারাটা মনে হয় ভালই মনে হবে কিন্তু আমরা তাকে একেবারে দুই চোখে দেখতে পারি না বলে কখনোই তার চেহারাটাকে ভাল মনে হয় নি। এখন রেগে যাবার পর তার

চেহারাটাকে আরো খারাপ মনে হতে থাকে– তাকে ঠিক মানুষ নয় একটা খ্যাপা কুকুরের মতো দেখাতে থাকে। স্যারের সব রাগ মনে হয় এইবার মেয়েটার ওপরে এসে পড়ল। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, নাকের গর্তগুলো বড় হয়ে গেল, মুখ থেকে দাঁতগুলো বের হয়ে এলো আর তাকে দেখাতে লাগলো ভয়ংকর। স্যারের এই চেহারাটা দেখেও মেয়েটা ভয় পেলো না, বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বলল, "প্লিজ স্যার আপনি মারবেন না। একজনকে মারলে কোন লাভ হয় না স্যার–"

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, স্যার রাগে অন্ধ হয়ে গেছেন, দিলীপকে নয় এখন এই খ্যাপা মেয়েটাকে মেরে বসবেন। আমি দেখতে পাচ্ছি তার হাত উপরে উঠে আসছে, আমি জানি এখন খপ করে মেয়েটার চুল ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন, তারপর মুখের মাঝে মারবেন। মেয়েটা কিছু লক্ষ্য করল বলে মনে হলো না, সে আগের মতোই ঠাণ্ডা গলায় বলতে লাগল, "স্যার আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে অন্যদের জিজ্ঞেস করেন। জিজ্ঞেস করেন স্যার–"

রাজাকার স্যার জিজ্ঞেস করার কোন উৎসাহ দেখালেন না, মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন তখন আমি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, "স্যার।"

স্যার মাথা ঘুরে তাকালেন। চোখ লাল করে বললেন, "কী?"

আমি ঠিক করেছি পালিয়ে যাব, এই স্কুলে আর আমাকে আসতে হবে না! আমি ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারি, কেউ আমাকে কিছু বলতে পারবে না, কেউ কিছু করতেও পারবে না। এটাই আমার সবচেয়ে বড় সুযোগ। এই সুযোগটা হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না– আমি হাত ছাড়া করলাম না; মুখ গম্ভীর করে বললাম, "কাউকে মারবেন না।"

প্রিয়াংকা নামের এই মেয়েটি কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে, রাজাকার স্যারের ভয়ংকর চোখ রাঙানির সামনেই সে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলে যাচ্ছে! আমার অবস্থা ঠিক তার উল্টো। আমি গত কয়েক বৎসর বলতে গেলে কারো সাথে কথা বলি নাই, কীভাবে কথা বলতে হয় আমি সেটা ভুলেই গেছি। তাই আমি যখন বললাম, "কাউকে মারবেন না।" সেটা শুনালো এরকম : "খবরদার! কাউকে মারবেন না। মারলে একেবারে খুন করে ফেলব।"

আমার কথা শুনে রাজাকার স্যার একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কয়েকবার চেষ্টা করে বললেন, "কী বললি?"

আমি বললাম, "বলেছি যে কাউকে মারবেন না।"

আমার গলার স্বরটা এবারে আগের থেকেও ভয়ানক শোনালো। কথা বলে অভ্যাস নেই বলে যেটাই বলি সেটাই ভয়ানক শোনায়, এবারের কথাটা শোনালো এরকম : "একটা কথা কয়বার বলতে হয়? শেষবারের মতো বলছি শুনে রাখেন, খবরদার আমাদের ক্লাসের কোন ছেলের গায়ে হাত তুলবেন না। যদি তুলেন তাহলে খবর আছে। খুন করে রাস্তায় লাশ ফেলে দেব! আমাকে চেনেন না? জন্মের মতো সিধে করে দেব।"

আমার কথায় ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। রাজাকার স্যার কেমন যেন মাছের মতো খাবি খেতে লাগলেন। সারা ক্লাশে একটা গুঞ্জন শুরু হলো— ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের যখন খুশি মারপিট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গুঞ্জন। রাজাকার স্যার দুর্বল গলায় বললেন, "চুপ।"

কিন্তু কেউ চুপ করল না বরং গুঞ্জনটা আরো বেড়ে গেল। আমি চারিদিকে তাকিয়ে বললাম, "চুপ।" সাথে সাথে পুরো ক্লাস চুপ করে গেলো।

রাজাকার স্যার বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "মারলে কী করবি?"

আমি বললাম, "মেরে দেখেন কী করি।"

আমার কথা শুনে সারা ক্লাসে একটা আতংকের শিহরণ বয়ে গেল, আমি স্পষ্ট দেখলাম ভয়ে ছেলে-মেয়েদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। ছেলে-মেয়েদের থেকে বেশি ভয় পেলেন রাজাকার স্যার, মাছের মতো খাবি খেতে লাগলেন। স্যার কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না, আমি তাই মেঘের মতো গলার স্বরে বললাম, "দিলীপ, তুই তোর জায়গায় গিয়ে বস। প্রিয়াংকা তুমিও চলে আস।"

আমার কথা শুনে দিলীপ সুড়ুৎ করে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল। প্রিয়াংকাও কী করবে বুঝতে না পেরে নিজের জায়গায় ফিরে এলো। রাজাকার স্যার আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আমিও সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ থেকে আগুন বের হওয়া বলে একটা কথা আছে, আমি সেটাই চেষ্টা করলাম। গত কয়েক বছর আমি মোটামুটি একটা পশুর মতো সময় কাটিয়েছি। আমার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা সবকিছু পশুর মতো হয়ে গিয়েছে, চোখের দৃষ্টিটাও মনে হয় সেইরকম হিংস্র হয়ে গেছে, রাজাকার স্যার সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলেন না, চোখ সরিয়ে নিলেন।

স্যার কিছুক্ষণ ক্লাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর বইটা হাতে নিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, "একত্রিশ পৃষ্ঠায় দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর লেখ। কথা বলবি না।"

কেউ কোন কথা বলল না, খাতা খুলে প্রশ্নের উত্তর লিখতে শুরু করল।

প্রিয়াংকা তার খাতা খুলতে খুলতে নিচু গলায় বলল, "তপু।"

আমি প্রিয়াংকার দিকে তাকালাম, বললাম, "কী হলো?"

"থ্যাংক ইউ তপু।" তারপর সে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা একবার স্পর্শ করল।

আমি কিছু না বলে সামনের দিকে তাকালাম। আহা! কতোদিন পরে একজন আমার সাথে ভাল করে, সুন্দর করে কথা বলল। কেউ যখন এরকম ভালবাসা নিয়ে কথা বলে তখন কী ভালই না লাগে। হঠাৎ করে আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমি ভেবেছিলাম আমার চোখের সব পানি শুকিয়ে গেছে, আসলে শুকায় নি। বুকের ভিতরে গভীরে কোন একটা জায়গায় এখনো মনে হয় অনেক চোখের পানি জমে আছে।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম

আমি বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়াটা কয়েক দিনের জন্যে পিছিয়ে দিলাম। কেন ঠিক পিছিয়ে দিলাম নিজেই জানি না, নিজেকে নিজে বোঝালাম যে বাসা থেকে সত্যি সত্যি পালিয়ে যাবার আগে আমার অন্তত একবার আম্মু, আপু আর ভাইয়ার সাথে শেষবার দেখা করে যাওয়া দরকার। সেটা অবশ্যি সত্যি কারণ হতে পারে না, আমাকে দেখলেই আম্মু যেভাবে খেপে যান যে দেখা না হওয়াই ভাল। আপু আর ভাইয়ার সাথে দেখা হলে তারা এতো অপ্রস্তুত হয়ে যায় যে কোথায় গিয়ে লুকাবে বুঝতে পারে না। তাই তাদের সাথে দেখা করে যাওয়াটাও আসল কারণ হতে পারে না। আমার ধারণা আসল কারণটা হচ্ছে প্রিয়াংকা, এই মেয়েটা একটু খ্যাপা টাইপের। মনে হচ্ছে ক্লাসে আরো কিছু অঘটন ঘটাবে, ঠিক কী অঘটন কীভাবে ঘটাবে সেটা দেখার একটা কৌতূহল হচ্ছে। তার ওপর রাজাকার স্যারকে যেভাবে হুমকি দিয়ে এসেছি সেটা নিয়ে স্কুলে একটু হৈচৈ হতে পারে, ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায় সেটা না দেখে পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

ডাইনিং টেবিলে বসে যখন আম্মু আপু আর ভাইয়া খেতে খেতে গল্প করে আমি তখন স্টোররুমে আমার বিছানাটায় গুটিশুটি মেরে বসে থাকি। তাদের কথাবার্তা পুরোটুকু শোনা যায় না, একটা দুটি কথা হঠাৎ মনে হয় ছিটকে ছিটকে আসে। আমি মাঝে মাঝে কান পেতে শোনার চেষ্টা করি তারা কী নিয়ে কথা বলে। আজকে মনে হচ্ছে তারা টেলিভিশনের কোন একটা নাটক নিয়ে কথা বলছে– আমার কাছে এসব কত দূরের একটা বিষয়। নাটকের কোন একটা চরিত্রের কথা বলে তিনজন হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। তাদের হাসির শব্দ শুনে মনে হলো সেটা বুঝি অন্য কোন জগৎ থেকে ভেসে আসছে! শুনতে শুনতে আমার বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। আমি দুই হাতে নিজের কান চেপে ধরে বসে থাকি, সবকিছু ভুলে মাথাটা ফাঁকা করে দেবার চেষ্টা করতে থাকি। আগে হলে কোন একটা বই খুলে কিছু একটা পড়ার চেষ্টা করতাম, বাসা থেকে পালিয়ে যাব ঠিক করার পর সেটাও ছেড়ে দিয়েছি। বনে-

জঙ্গলে, নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতেই যখন জীবনটা কাটিয়ে দেব তখন শুধু শুধু পড়াশোনা করে সময় নষ্ট করে কী হবে?

ঠিক যখন রাত দশটার ঘণ্টা বাজলো তখন স্টোররুমের দরজার পিছন থেকে ছোট একটা নেংটি ইঁদুর খুব সাবধানে মাথা বের করল। নেংটি ইঁদুরের সময়ের জ্ঞান যে এতো ভাল আমি কখনো জানতাম না। গত কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছি ঠিক দশটার সময় এই নেংটি ইঁদুরটা স্টোররুমের দরজার পিছন থেকে উঁকি দেয়। প্রথম কয়েক দিন আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, এখন আমাকে দেখে একটু অভ্যস্ত হয়েছে। নেংটি ইঁদুরের প্রিয় খাবার কী কে জানে– আমি রুটির কয়েকটা টুকরো ছড়িয়ে রেখেছিলাম, গত কয়েক দিন থেকে দেখছি টুকরোগুলো দুই হাতে ধরে কুট কুট করে খাচ্ছে। নেংটি ইঁদুরের খাওয়ার ভঙ্গিটা ভারি সুন্দর, দেখে আমার এতো মজা লাগে যে বলার মতো নয়। আমার হাতে ছোট এক টুকরো রুটি ছিল, সেটা এগিয়ে দিলাম, নেংটি ইঁদুরটা একটা ছোট লাফ দিয়ে সরে গেলো। দূর থেকে আমাকে সাবধানে লক্ষ্য করল, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে রুটির টুকরোটা মুখে করে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেল। আমার দিকে সাবধানে তাকিয়ে সে দুই হাতে টুকরোটা ধরে কুটুর কুটুর করে খেতে শুরু করে। আমি ফিসফিস করে নেংটি ইঁদুরটাকে ডাকলাম, "এই! এই পিচকি। এই মিচকি!"

নেংটি ইঁদুরটা আমার ডাক শুনে খুব যে উৎসাহিত হলো সেরকম মনে হলো না, সাবধানে রুটির টুকরোটা নিয়ে আরেকটু দূরে সরে গেলো। আমি আরেকটু গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, "মিচকি। এই মিচকি।"

নেংটি ইঁদুরটা এবার একটু ভড়কে গিয়ে তার রুটির টুকরোটা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। আমি অবশ্যি খুব হতাশ হলাম না, কারণ আমি জানি আগামীকাল রাত দশটার সময় সে আবার এসে হাজির হবে। আবার ইতিউতি তাকিয়ে আমার আরেকটু কাছে আসবে। এই বাসায় আমার একমাত্র বন্ধু এই নেংটি ইঁদুর, ব্যাপারটার মাঝে কোথায় জানি একটু দুঃখের চিহ্ন আছে।

পরের দিন ক্লাসে গিয়ে আমি মনে মনে আশা করছিলাম যে প্রিয়াংকা আজকেও আমার পাশে বসবে। কিন্তু দেখলাম সে আজকে অন্য পাশে বসেছে। আজকেও তার মুখে এক ধরনের হাসি, চারিদিকে দেখতে দেখতে পা দোলাচ্ছে, দেখে মনে হয় পুরো ক্লাসটা যেন একটা নাটকের দৃশ্য, সে যেন একজন দর্শক এবং

যেন খুব আগ্রহ নিয়ে নাটকটা দেখছে। আমি আমার সিটে বসলাম, অন্যদিন হলে ক্লাস রুমে থেকে বের হয়ে বাউন্ডারি ওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসতাম। আজ আর বের হলাম না, প্রিয়াংকা যেরকম আগ্রহ নিয়ে পুরো ক্লাসকে দেখে আমিও অনেকটা সেভাবে দেখতে শুরু করলাম।

ব্যাপারটি মন্দ না, যেমন ধরা যাক ইশতিয়াকের ব্যাপারটা। সে যে এতো মনোযোগ দিয়ে কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে পারে আমি সেটা জানতাম না। তাকে দেখে মনে হয় চুলকাতে চুলকাতে কানের মাঝে গর্ত করে ফেলবে। আদনান পকেট থেকে কী একটা বের করে মুখে দিয়ে খাচ্ছে, খুব সতর্কভাবে খাচ্ছে যেন কেউ বুঝতে না পারে। বুঝতে পারলে যদি ভাগ দিতে হয় সেজন্যে এরকম সাবধান। নাঈমা নামের ফর্সা মেয়েটা নিজের চেহারা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব সচেতন, ব্যাগ থেকে ছোট একটা আয়না বের করে নিজেকে দেখে চুলগুলো একটু সামনে নিয়ে এসে আবার আয়নাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। মুশফিক আর জহুরুল গল্প করছে, কি নিয়ে গল্প করছে শোনা যাচ্ছে না কিন্তু বিষয়টা নিশ্চয়ই খুব মজার। দুইজনে দাঁত বের করে হি হি করে হাসছে! মানুষকে হাসতে দেখা খুব মজার একটা বিষয়, তাদেরকে দেখে আমারও হাসি পেয়ে গেলো!

আমাদের ক্লাসের দুই ভাল ছাত্র জয়ন্ত আর মামুন নিশ্চয়ই কোন জ্ঞানের বিষয় নিয়ে কথা বলছে কারণ দুইজনের চোখে-মুখেই এক ধরনের গম্ভীর ভাব। তারা কথা বলতে বলতে আমার কাছাকাছি চলে এলো বলে জ্ঞানের বিষয়টা আমিও শুনতে পেলাম, জয়ন্ত বলছে, "বল দেখি কোন সংখ্যাকে যতবার সেটা দিয়ে গুণ করা হোক প্রথম সংখ্যা সেটাই হয়?"

এই সহজ বিষয়টা নিয়ে দুইজন এরকম গম্ভীর হয়ে কথা বলছে দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল! এরকম সংখ্যা দুটি হচ্ছে পাঁচ আর ছয়। মামুন দেখলাম কয়েকবার মাথা চুলকে চিন্তাভাবনা করে বলল, "পাঁচ।"

জয়ন্ত বলল, "আরো একটা আছে।"

মামুন আবার মাথা চুলকাতে শুরু করল। একটু চিন্তা করে বলল, "ছয়।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। এবার বল দেখি দুই অংকের কোন সংখ্যাকে যতবার নিজের সাথে গুণ করা যায় ততবার প্রথমে সেই সংখ্যাটা পাওয়া যায়?"

মামুনকে আবার একটু বিভ্রান্ত দেখায়। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে শুরু করে। মামুন সবসময় পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়, অথচ এরকম সহজ একটা জিনিস চিন্তা করে বের করতে তার এতোক্ষণ লাগে? যে কেউ বলতে পারবে, সংখ্যাটা হচ্ছে পঁচিশ।

মামুন বলল, "দাঁড়া ক্যালকুলেটরটা নিয়ে আসি।"

জয়ন্ত বলল, "উঁহুঁ ক্যালকুলেটর দিয়ে করলে হবে না। এমনি এমনি বের করতে হবে।"

মামুন বলল, "এতগুলো গুণ করব? একশ'টার মতো–"

আমার আবার হাসি পেলো, শুধু নামেই ফার্স্ট-সেকেন্ড আসলে মাথায় কিছু নেই। বোঝাই যাচ্ছে সংখ্যার প্রথম অংকটা হবে পাঁচ না হয় ছয়। শুধু সেই সংখ্যাগুলো পরীক্ষা করলে হয়। যেমন পনেরো, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ– কিংবা ষোল, ছাব্বিশ, ছত্রিশ। কতোক্ষণ আর লাগবে?

মামুন এবারে একটা কাগজ নিয়ে গুণ করতে শুরু করল, কী আশ্চর্য! এই সংখ্যাগুলো গুণ করতে কাগজ-কলম লাগে? মাথার ভিতরেই তো করে ফেলা যায়। পঁচিশ পঁচিশে ছয়শ পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশে বারোশ পঁচিশ, পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশে দুই হাজার পঁচিশ।

মামুন অনেক সময় লাগিয়ে সবগুলো গুণ করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পঁচিশ।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "গুড।"

তারপর দুজন হেঁটে চলে গেলো। দুই অংকের আরেকটা সংখ্যা হচ্ছে ছিয়াত্তর, এই দুজন সেটা মনে হয় জানেই না। আমার একবার ইচ্ছে হলো জয়ন্ত আর মামুনকে ডেকে সেটা বলি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বললাম না। এরা হচ্ছে ক্লাসের ভাল ছেলে তারা জ্ঞানের কথাবার্তা বলে, আমি হচ্ছি ক্লাসের খারাপ ছেলে আমিও যদি তাদের সাথে জ্ঞানের কথাবার্তায় যোগ দিই তাহলে তারা ভড়কে যেতে পারে।

জয়ন্ত আর মামুন চলে যাবার পর আমি হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম দুই অংকের সংখ্যা পঁচিশ এবং ছিয়াত্তরের মতো তিন অংকেরও দুটি সংখ্যা আছে সেগুলো হচ্ছে তিনশ' ছিয়াত্তর আর ছয়শ' পঁচিশ। শুধু তাই না চার অংকেরও একটা সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে নয় হাজার তিনশ' ছিয়াত্তর। এর চাইতে বড় সংখ্যাও আছে আমি সেটা ভেবে বের করতে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমার একটা অন্য জিনিস মনে হলো। জয়ন্ত আর মামুন দুইজন হচ্ছে আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র, তাদের এই সহজ জিনিসগুলো বের করতে এতো সমস্যা হচ্ছে কেন? নাকি উল্টোটা সত্যি, যে জিনিসগুলো এতো সহজ নয়, কোন কারণে আমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে? বিষয়টা কীভাবে পরীক্ষা করা যায়? কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারলে হতো, কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব? আমার একমাত্র বন্ধু হচ্ছে বাসায় সেই নেংটি ইঁদুরটি। সে আসবে রাত দশটায়, তাকে

যদি জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা মিচকি, বল দেখি কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে প্রথমে সেই সংখ্যাটা পাওয়া যায়? তখন সে কী করবে? বিষয়টা চিন্তা করেই আমার একটু হাসি পেয়ে গেলো।

আমি ক্লাসে বহুকাল কোন কিছুতেই মনোযোগ দিই না, আজকে জ্যামিতি ক্লাসে একটু মনোযোগ দিয়ে স্যারের কথা শোনার চেষ্টা করলাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলাম স্যার ক্লাসে রীতিমতো হাস্যকর জিনিস পড়াচ্ছেন। অনেক কষ্ট করে একটা উপপাদ্য প্রমাণ করলেন যেটা অনেক সহজেই অন্যভাবে প্রমাণ করা সম্ভব কিন্তু আমি সেটা বলার চেষ্টা করলাম না। আমি অনেক দিন পর আমাদের গণিত বইটা উল্টেপাল্টে দেখলাম, ভিতরের বিষয়বস্তু আশ্চর্য রকম সহজ। আমি আবার একটা ধন্দের মাঝে পড়ে গেলাম– বিষয়টা আসলেই সহজ নাকী আমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে?

দুপুর বেলা ইংরেজি ক্লাস হচ্ছে তখন স্কুলের দপ্তরি কালীপদ ইংরেজি স্যারের কাছে একটা চিরকুট নিয়ে এলো। স্যার চিরকুট পড়ে ভুরু কুঁচকালেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরিফুল ইসলাম তপু আর প্রিয়াংকা চৌধুরী কে?"

ক্লাসের দুই পাশ থেকে আমি আর প্রিয়াংকা উঠে দাঁড়ালাম। স্যার খানিকক্ষণ আমাদের দুজনকে একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তারপর বললেন, "তোমাদের দুইজনকে প্রিন্সিপাল ডেকে পাঠিয়েছেন।"

সারা ক্লাসে আতংকের একটা ফিসফিসানি শোনা গেলো। আমাদের স্কুলের আগের প্রিন্সিপাল ছিলেন খুব হাসিখুশি মানুষ। মাসখানেক হলো নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন, তিনি মহিলা এবং কমবয়সী। তার চেহারা খুব সুন্দর কিন্তু সেটা যেন কেউ বুঝতে না পারে সেজন্যে একেবারে সাজগোজ করেন না। বুড়ো মানুষের একটা চশমা পরে থাকেন এবং সব সময় মুখটা পাথরের মতো শক্ত করে রাখেন। আমরা শুনেছি এই ম্যাডাম নাকী অসম্ভব কড়া, আমাদের পুরো স্কুলটাকে এক মাসের মাঝে একেবারে ধনুকের ছিলার মতো সোজা করে ফেলেছেন! সেই প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন সেটা একটা ভয়ের ব্যাপার হতেই পারে।

ইংরেজি স্যার বললেন, "যাও দেখা করতে যাও।"

আমি আর প্রিয়াংকা দপ্তরি কালীপদের সাথে ক্লাস রুম থেকে বের হলাম। প্রিয়াংকা গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কী তপু? আমাদের ডেকেছে কেন?"

"রাজাকার স্যার নিশ্চয়ই নালিশ করেছে।"

"কী স্যার?"

"রাজাকার স্যার।" আমি ব্যাখ্যা করলাম, "বাংলা স্যারের নাম হচ্ছে রাজাকার স্যার।"

"কেন?"

"কয়দিন থাকলেই বুঝতে পারবে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় নাকী রগ কাটতেন।"

শুনে প্রিয়াংকা কেমন যেন চমকে উঠল। আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যে আমি বুঝতে পারলাম সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। না করলে নাই– কয়দিন গেলে নিজেই বুঝতে পারবে।

প্রিন্সিপাল ম্যাডামের রুমে গিয়ে বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা সত্যি। রাজাকার স্যার প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন। কালীপদ বলল, "আপা এই যে, এই দুইজন।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কী একটা কাগজ দেখছিলেন, সেটা সরিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তার চোখের দৃষ্টি খুব পরিষ্কার, মুখে কিছু না বললেও চোখ দিয়ে বলছেন, "তোমাদের মতো পাজী নচ্ছাড় বেয়াদব ছেলে-মেয়ে আমি অনেকবার দেখেছি, আগে আমি তাদের সিধে করে ছেড়ে দিয়েছি, তোমাদেরকেও সিধে করে ছাড়ব।"

আমি আর প্রিয়াংকা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বড় একটা টেবিল ঘিরে বেশ কয়েকটা চেয়ার। ভারি পর্দা, দেয়ালের সাথে লাগানো বেশ কয়েকটা শেলফ, সেগুলো বোঝাই বই দিয়ে। এক পাশে একটা আলমারি, সেখানে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা স্পোর্টস, ডিবেট, ছবি আঁকার কম্পিটিশান এসব করে যেসব কাপ, শিল্ড আর মেডেল এনেছে সেগুলি সাজানো আছে। আমি খারাপ হয়ে যাবার আগে যখন খুব ভাল ছিলাম তখন ডিবেট করে বড় একটা কাপ এনেছিলাম। সেই কাপটাও নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একবার আমার দিকে আরেকবার প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "তোমাদের বিরুদ্ধে আমি যেটা শুনছি সেটা সত্যি?"

আমি কিছু বললাম না, শুধু উদাস মুখে শরীরের ভরটা এক পা থেকে অন্য পায়ের উপর সরিয়ে নিলাম। প্রিয়াংকা খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারে, সে বলল, "আপনি কী শুনেছেন সেটা জানলে বলতে পারতাম ম্যাডাম।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম রাজাকার স্যারকে দেখিয়ে বললেন, "তোমাদের এই স্যার বলেছেন, তোমরা তার সাথে খুব বড় বেয়াদবি করেছ।"

প্রিয়াংকা ম্যাডামের কথা শুনে একটুও ঘাবড়াল না, বেশ হাসি হাসি মুখে বলল, "স্যার যদি বলে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সত্যি। স্যারের কাছে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে আমরা বেয়াদবি করে ফেলেছি। কিন্তু ম্যাডাম–"

"কিন্তু কী?"

"আমরা একটুও বেয়াদবি করতে চাইনি ম্যাডাম।"

"করতে না চাইলে সেটা কেমন করে হয়?"

রাজাকার স্যার হঠাৎ করে সোজা হয়ে বসে বললেন, "আমি আপনাকে বলি কী হয়েছে। এই যে মেয়েটাকে দেখছেন, এ নতুন এসেছে। কোন স্কুল থেকে এসেছে জানি না। ডিসিপ্লিনের খুব অভাব– ক্লাসে ঢুকেই দেখি পিছনের বেঞ্চে বসে কথা বলছে। আমি বললাম, সামনে এসে বসো। সে বলল বসবে না। কতো বড় বেয়াদব শুধু যে সামনে এসে বসল না তা না, আমার সাথে মুখে মুখে তর্ক জুড়ে দিল।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম শীতল চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কিছু বলার আছে মেয়ে?"

প্রিয়াংকা একটু চোখ বড় বড় করে একবার প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একবার রাজাকার স্যারের দিকে তাকাচ্ছিল, এক মুহূর্তের জন্যে একবার আমার দিকেও তাকালো। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এবার ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "আছে কিছু বলার?"

প্রিয়াংকা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে, ভাল ফুটবল খেলা বা ভাল গান গাইতে পারার মতো এটাও নিশ্চয়ই একটা বড় গুণ। আমি শুনলাম প্রিয়াংকা বলল, "জি ম্যাডাম, আমার কিছু বলার তো নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমার মনে হয় কিছু না বলাটাই সবচেয়ে ভাল হবে।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেন? না বলাটা কেন ভাল হবে?"

"যদি আমি কিছু বলি সেটা অন্যরকম শুনাবে। মনে হবে, মনে হবে–"

"কী মনে হবে?"

"মনে হবে স্যার যে কথাটা বলছেন আমি সেটা অস্বীকার করছি।"

রাজাকার স্যার এবারে কেমন যেন খেপে গেলেন, প্রায় টেবিলে থাবা দিয়ে বললেন, "দেখেছেন? দেখেছেন কতো বড় বেয়াদব? বলার চেষ্টা করছে আমি মিথ্যা কথা বলছি–"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম হাত তুলে রাজাকার স্যারকে থামালেন। তারপর আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, বললেন, "আর তুমি? তুমি কী করেছ?"

আমি কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজাকার স্যার বললেন, "এর কথা ছেড়ে দেন ম্যাডাম। একে যদি এখনই টি.সি. দিয়ে স্কুল থেকে বিদায় না করেন তাহলে কিন্তু স্কুলের বেইজ্জতি হয়ে যাবে।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ভুরু কুঁচকে রাজাকার স্যারের দিকে তাকালেন, "কেন?"

"আর কয়দিন পরে এই ছেলে মানুষ মার্ডার করবে। এর চেহারাটা একবার দেখেন। এর কতো বড় সাহস, ক্লাসে আমাকে থ্রেট করে–"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার দিকে ভাল করে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি?"

আমি এবারেও কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম। কথা না বলতে বলতে আমি ঠিক করে কথা বলতেই ভুলে গেছি। মুখ খুলে কিছু একটা বলতে গেলেই উল্টাপাল্টা কিছু একটা বলে ফেলব তখন আরো বড় ঝামেলা হয়ে যাবে। এর থেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল।

রাজাকার স্যার থামলেন না, বললেন, "আপনি নতুন এসেছেন তাই আপনি জানেন না। এ একসময়ে খুব ভাল ছাত্র ছিল। তারপর হঠাৎ করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বদমাইশ হয়ে গেলো– এখন পরীক্ষায় পাস করতে পারে না। দিনরাত রাস্তাঘাটে মারামারি করে। রীতিমতো গুণ্ডা। সন্ত্রাসী।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আবার আমার দিকে তাকালেন, খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি?"

আমি এবারেও কিছু বললাম না। এই পৃথিবীতে বিচার বলে যে কিছু নেই সেটা আমার থেকে ভাল করে কেউ জানে না, কাজেই প্রিন্সিপাল ম্যাডাম যে রাজাকার স্যারের কথা বিশ্বাস করে আমাকে টি.সি. দিয়ে বিদায় করে দেবেন সে ব্যাপারে আমার একটুও সন্দেহ নাই। তবে এখন তাতে আর কিছু আসে যায় না, আমি বাসা থেকে যখন পালিয়েই যাব তখন টি.সি. দিয়ে আর না দিয়ে পালিয়ে যাবার মাঝে পার্থক্য কী?

রাজাকার স্যার বললেন, "এক ঝুড়ি আপেলের মাঝে একটা পচা আপেল থাকলে সব আপেল পচে যায়। এ হচ্ছে পচা আপেল, একে যদি এখনই বিদায় না করেন পুরো ক্লাসকে কিন্তু নষ্ট করে দেবে।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার দিকে তাকালেন, "তোমার কিছু বলার আছে?"

আমার অনেক কিছুই বলার আছে কিন্তু আমি তো গুছিয়ে কথা বলতে পারব না। তবে সারা জীবনের জন্যে যখন চলেই যাচ্ছি তখন যা খুশি বলে

দিলে ক্ষতি কী? আর কেউ তো কখনো এটা করতে পারবে না। আমি প্রিন্সিপাল ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললাম, "জি ম্যাডাম। বলার আছে।"

"কী বলার আছে?"

"আমাকে যদি বের করতেই হয় তাহলে ঐ স্যারকেও বের করে দিতে হবে।"

কথাটা আমি ভেবে বলি নাই, বলে ফেলার পর কথাটা শুনে আমি নিজেই চমকে উঠলাম, বলেছি কী আমি? কিন্তু বলে যখন ফেলেছিই এটা তো আর ফিরিয়ে নেয়ার উপায় নেই। রাজাকার স্যারের চোয়ালটা কেমন যেন ঝুলে পড়ল, মাছের মতো খাবি খেলেন কয়েকবার। প্রিয়াংকা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে মনে হলো আমার কথা বুঝতে পারছেন না। খুব ধীরে ধীরে তার মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলো, শোনা যায় না এরকম গলায় আস্তে আস্তে বললেন, "ছেলে, তোমার তো সাহস কম না, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার স্যারের সম্পর্কে এরকম একটা কথা বলো?"

প্রিয়াংকা আমার জায়গায় হলে নিশ্চয়ই কী চমৎকার একটা উত্তর দিতে পারতো, আমি কিছুই বলতে পারলাম না। কী বলা যায় সেটা চিন্তা করতে করতে আবার নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, "আমি যদি পচা আপেল হই তাহলে স্যারও পচা আপেল।"

আমার কথা শুনে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের চোখগুলো বড় বড় হয়ে উঠল। ম্যাডাম তার চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে বললেন, "ছেলে, তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না।"

"তাহলে?"

আমি চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, "তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?"

রাজাকার স্যার আমার জন্যে উত্তরটা দিয়ে দিলেন, বললেন, "এই পাজী ছেলেটা এইভাবেই কথা বলে। এর মতো বেয়াদব ছেলে স্কুলে আর একটাও নাই।"

আমি রাজাকার স্যারের দিকে না তাকিয়ে প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে বললাম, "ম্যাডাম, আমাকে তো স্কুল থেকে তাড়িয়েই দিবেন, তাই যাওয়ার আগে আপনাকে সত্যি কথাটা বলে যাই।"

রাজাকার স্যার চিৎকার করে বললেন, "চোপ। চোপ বেয়াদব ছেলে–"

আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছি, আরও গলা উঁচিয়ে বললাম, "এই স্যার ক্লাসে কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতা পড়ান না। এই স্যার মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ক্লাসে টিটকারি মারেন। এই স্যার হিন্দু ছাত্রদের পিটান–"

রাজাকার স্যারের মুখটা ভয়ংকর রাগে কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেল, ঘরে আর কেউ না থাকলে একেবারে নিশ্চয়ই আমাকে খুন করে ফেলতেন। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেমন যেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, "তুমি কী বলছ ছেলে?"

আমি সোজাসুজি প্রিন্সিপাল ম্যাডামের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি সত্যি কথা বলছি।"

রাজাকার স্যার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে বললেন, "আপনি আমার সাথে আসেন ম্যাডাম। ক্লাসে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন–"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এক ধরনের অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে রাজাকার স্যারের দিকে তাকালেন, বললেন, "তার কোন প্রয়োজন নেই সরকার সাহেব।"

"তাহলে, তাহলে–"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এক ধরনের ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "আমি ব্যাপারটা দেখছি। আপনি এখন আসুন।"

রাজাকার স্যার হঠাৎ করে কেমন জানি চুপসে গেলেন। দাঁড়িয়ে থেকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, ঠিক বলতে পারলেন না, একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন তারপর বের হয়ে গেলেন।

আমি আর প্রিয়াংকা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম অন্যমনস্কভাবে টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করতে করতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তাকে দেখে মনে হতে লাগলো যেন ভুলেই গেছেন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না তখন ম্যাডাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা ক্লাসে যাও।"

আমি আর প্রিয়াংকা প্রিন্সিপাল ম্যাডামের অফিস থেকে বের হয়ে এলাম।

কবিতা এবং মুক্তিযুদ্ধ

জ্যামিতির ক্লাস টেস্টে মামুন পেলো আশি, জয়ন্ত সত্তুর অন্যেরা তার থেকে অনেক কম। পরীক্ষাটি ছিল একেবারে পানির মতো সোজা আমি নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটার উত্তর লিখেছি কিন্তু আমি পেয়েছি শূন্য। ক্লাস টেস্টের খাতা দেয়ার সময় স্যার বলেছেন আমাকে কেন শূন্য দিয়েছেন, আমি অন্যের খাতা দেখে লেখেছি বলে কোন নম্বর দেন নি। খাতা দেওয়ার সময় জ্যামিতি স্যার ন্যায় এবং সততার উপরে বড় একটা লেকচার দিলেন। অন্যের খাতা দেখে লিখলে কিছু যে শেখা যায় না উল্টো একজন অপরাধী হিসেবে বড় হতে হয়, চরিত্রের মাঝে হীনম্মন্যতা ঢুকে যায়– স্যার সেটাও খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দিলেন।

সবই ঠিক আছে, কিন্তু একটিমাত্র সমস্যা— আমি কারো খাতা দেখে লিখি নি। জ্যামিতির উপপাদ্য আর সম্পাদ্যগুলো আমি নিজেই করেছি, স্যারকে আর সেটা বলার চেষ্টা করলাম না। তাহলে অন্যের খাতা দেখে লেখার সাথে সাথে মিথ্যা কথা বলার অপরাধটাও যোগ হবে! এমনিতেই নানারকম ঝামেলার মাঝে আছি তার মাঝে এই নতুন ঝামেলা শুরু করার কোন ইচ্ছে নেই। স্যার ক্লাসে উপপাদ্য এবং সম্পাদ্যগুলো বুঝিয়ে দিলেন, কয়েকটা আরো অনেক সহজভাবে করা যায়, স্যার সেটা জানেন না।

ক্লাসের শেষে প্রিয়াংকা আমার কাছে এলো, বলল, "তপু।"

আমি বললাম, "কী?"

"তোমার ক্লাস টেস্টের খাতাটা আমাকে দেখাবে?"

"কেন?"

"কারণ আছে।"

আমি বললাম, "আমি শূন্য পেয়েছি। আমার খাতা দেখে কোন লাভ নাই। মামুন না হলে জয়ন্তের খাতাটা দেখো।"

প্রিয়াংকা বলল, "আমি তোমারটাই দেখতে চাই।"

আমি আমার খাতাটা বের করে দিলাম। প্রিয়াংকা খানিকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে খাতাটা আমাকে ফেরত দিয়ে বলল, "তোমার সবগুলো ঠিক হয়েছে।"

আমি মাথা নাড়লাম বললাম, "হ্যাঁ।"

"স্যার বলেছেন তুমি অন্যের থেকে দেখে লেখেছ তাই তোমাকে শূন্য দিয়েছেন।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"ক্লাস টেস্টের দিনে আমি তোমার পিছনে বসেছিলাম আমি দেখেছি তুমি কারো খাতা দেখে লিখ নি। তুমি নিজে নিজে লিখেছ।"

আমি এইবার একটু হাসলাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"তুমি কেন সেটা স্যারকে বললে না?"

"আমি যদি বলতাম স্যার সেইটা বিশ্বাস করতো না। কোন ভাল জিনিসের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই– তুমি সেটা জানো না?"

প্রিয়াংকা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "তুমি এতো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছ কেন?"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

আমি ক্লাস টেস্টের খাতাটা ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে বললাম, "এর মাঝে বোঝার কিছু নাই।"

প্রিয়াংকা বলল, "তুমি খুব ভাল অঙ্ক জানো তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "উঁহুঁ।"

"তোমার কী অঙ্ক ভাল লাগে?"

আমি আমার সিটে হেলান দিয়ে বললাম, "আমার কিছু ভাল লাগে না।"

প্রিয়াংকা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের জায়গায় ফিরে গেলো।

থার্ড পিরিয়ডে বাংলা ক্লাসে রাজাকার স্যার আসবেন, আমি ভিতরে ভিতরে একটা কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছি, স্যার ক্লাসে এসে আজকে কী করেন দেখতে চাই। আজকেও জয়ন্ত দীলিপ আর সলীলকে পেটান কী না, নীলিমা আর মাধুরীকে খামোখা যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল করেন কী না দেখার জন্যে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

কিন্তু আজ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটলো, ক্লাসে রাজাকার স্যারের বদলে এলেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম হাত দিয়ে আমাদের বসার জন্যে ইঙ্গিত করে বললেন "বসো। বসো।"

আমরা নিজেদের জায়গায় বসেছি। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম পুরো ক্লাসে একবার

চোখ বুলিয়ে বললেন, "আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি নিয়মিত কোন একটা ক্লাস নিই, কিন্তু এমন ঝামেলার মাঝে থাকি ক্লাস নেবো কেমন করে– অফিস থেকেই বের হতে পারি না।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কথা শেষ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন আর সাথে সাথে আমরা সবাই আবার বুঝতে পারলাম, প্রিন্সিপাল ম্যাডামের চেহারা খুব সুন্দর, তিনি শুধু সেটা কাউকে জানতে দিতে চান না। প্রিন্সিপাল ম্যাডামের হাসিটি পুরো ক্লাসের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল এবং আমরা সবাই কোন কারণ ছাড়াই হাসলাম।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের একটু খোঁজখবর নিলেন, কার নাম কী, বাসা কোথায়– এসব ব্যাপার নিয়েও দুই-চারজনের সাথে কথা বললেন। পড়াশোনা কেমন হচ্ছে জানতে চাইলেন, তারপর হালকা পায়ে একটু হেঁটে ক্লাসরুমের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বললেন, "এটা তোমাদের বাংলা ক্লাস, তাই বাংলা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলা দরকার, কী বলো?"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা বল দেখি বাংলা ভাষাটাকে একটা নতুন মাত্রা দেয়ার জন্যে যদি শুধুমাত্র একজন মানুষের নাম বলতে হয় সেই মানুষটা কে হবে?"

ক্লাসের অনেকে উত্তর বলার জন্যে হাত তুললো এবং যাদের উৎসাহ বেশি তারা চিৎকার করে বলল, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, বললেন, "ভেরি গুড।" তারপর আর দুই পা এগিয়ে এসে বললেন, "এই বুড়ো মানুষটি বাংলা ভাষাকে যতটুকু সমৃদ্ধ করেছেন পৃথিবীর আর কোন মানুষ একা তাদের ভাষাকে ততটুকু সমৃদ্ধ করতে পারে নি।"

সত্যি কথা বলতে কী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন না অনেকে মিলে করেছেন সেটা নিয়ে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের খুব একটা মাথাব্যথা আছে বলে মনে হলো না। তবে ম্যাডাম এতো সুন্দর করে কথা বলেন যে সবাই ভান করতে লাগল ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আরেকটু এগিয়ে এসে বললেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন সেটা কীভাবে বোঝা যায় বলো দেখি?"

এবারে সবাই মুখ গম্ভীর করে চিন্তা করতে লাগল কী বলা যায়। কেউ কিছু বলার আগেই ম্যাডাম নিজে থেকে বললেন, "সেটা বোঝার জন্যে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য নিয়েও গবেষণা করতে হয় না– তার যে কোন একটা কবিতা পড়লেই সেটা বুঝে ফেলা যায়।"

কথা শেষ করে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এমনভাবে আমাদের দিকে তাকালেন যে আমরা সবাই তার কথা বিশ্বাস করে ফেললাম। ম্যাডাম এবার একেবারে সামনের বেঞ্চে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছ। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমাদের অনেকের রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ আছে। কে আমাদের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে পারবে?"

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতাটি আবৃত্তি করতাম, অনেক দিন সেটা প্র্যাকটিস করি নি কিন্তু আমার নিশ্চয়ই এখনো মনে আছে, কিন্তু আমি আবৃত্তি করার কোন আগ্রহ দেখলাম না। আমি যদি এখন এই কবিতাটি আবৃত্তি করার চেষ্টা করি সেটা এতো বেখাপ্পা শোনাবে যে বলার মতো নয়। আমি এখন একটা দুষ্টু ও পাজী ছেলে– দুষ্টু এবং পাজী ছেলেরা কখনো কবিতা আবৃত্তি করে না।

জয়ন্ত প্রথমে সোনার তরী কবিতাটি শোনালো– ঠিক আবৃত্তি নয় মুখস্ত বলে গেলো। তারপর আমাদের ক্লাসের শিল্পী মৌটুসী আজি হতে শতবর্ষ পরে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালো। মৌটুসীর গলা খুব ভাল, উচ্চারণও সুন্দর, তাই খুব সুন্দর শোনালো কবিতাটি। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম খুব খুশি হলেন শুনে। তখন প্রিয়াংকা হাত তুললো কিছু একটা বলার জন্যে। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কোন কবিতাটা আবৃত্তি করতে চাও?"

প্রিয়াংকা বলল, "আমি আবৃত্তি করতে চাই না ম্যাডাম।"

"তাহলে?"

"আপনি আমাদের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম অবাক হয়ে বললেন, "আমি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম।" প্রিয়াংকা খুব সহজ গলায় বলল, "আপনার সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটা একটু আবৃত্তি করে শোনাবেন প্লিজ!"

প্রিয়াংকা মেয়েটা একটু অন্যরকম। এমনভাবে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সাথে কথা বলছে যেন তাঁর সাথে তার কতো দিনের পরিচয়, যেন ম্যাডাম আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল নন, যেন আমাদের ক্লাসেরই আরেকজন। প্রিয়াংকা না হয়ে অন্য কোন একজন এই কথা বললে সেটা কিন্তু মোটেই এতো স্বাভাবিক শোনাতো না।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কিছুক্ষণ কিছু একটা ভাবলেন, ভেবে বললেন, "আমার প্রিয় কবিতা তো একটা নয়, অনেকগুলো।"

প্রিয়াংকা বলল, "তার মাঝে যে কোন একটা আবৃত্তি করেন, প্লিজ।"

আমার ধারণা ছিল ম্যাডাম হয়তো রাজি হবেন না, কিন্তু একটু অবাক হয়ে দেখলাম বেশ সহজেই রাজি হয়ে গেলেন, কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে সরাসরি আবৃত্তি শুরু করে দিলেন,

"আমরা দুজন একই গাঁয়ে থাকি,
সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে আমার নাচে বুক।"

ম্যাডাম এতো সুন্দর করে কবিতাটা শোনাতে লাগলেন যে খঞ্জনা নামের সেই গ্রামের পুরো দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম এই গ্রামটির ভেতর দিয়ে অঞ্জনা নামের নদীটি বয়ে যাচ্ছে আর সেই নদীর তীরে রঞ্জনা নামে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কী গান কবিতা এইসব জিনিসকে সব সময় আমার কাছে ন্যাকামি টাইপের জিনিস বলে মনে হতো– যারা এগুলো করে তাদেরকে মনে হতো হাস্যকর একধরনের মানুষ। কিন্তু প্রিন্সিপাল ম্যাডামের মুখে কবিতাটা শুনে আমার সমস্ত ধারণাটাই পাল্টে গেলো, আমার মনে হতে লাগলো কবিতার মতো সুন্দর জিনিস পৃথবীতে আর কিছু নেই। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম যে খুব সুন্দর করে আবৃত্তি করেন তা নয় কিন্তু কবিতার মাঝে এমনভাবে তার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন যে কবিতাটা একেবারে অন্যরকম কিছু একটা হয়ে গেলো। কবিতাটা শেষ হবার পরও আমরা কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে বসে থাকলাম, আমাদের মনে হতে লাগল আমরা যদি কথা বলি তাহলে কিছু একটা নষ্ট হয়ে যাবে– সেই কিছু একটা যে কী আমরা কেউই সেটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "অনেক দিন পর আজকে একটা কবিতা বললাম।"

শিউলি বলল, "আপনি এতো সুন্দর করে কবিতা বলেন ম্যাডাম!"

শিউলি আমাদের ক্লাশের সবচেয়ে চুপচাপ মেয়ে, সে যে এভাবে নিজে থেকে কিছু বলবে আমরা বুঝতেই পারি নি, কিন্তু কথাটাকে একটুও অস্বাভাবিক মনে হলো না। আমরা সবাই শিউলির কথার সাথে সাথে মাথা নাড়লাম। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বললেন, "আসলে আমি সুন্দর করে কবিতা বলি নি, কবিতাটাই খুব সুন্দর।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম হালকা পায়ে হেঁটে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে আবার ক্লাসের মাঝামাঝি এসে বললেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সারা পৃথিবীর সকল কবি সাহিত্যিক গীতিকার থেকে একটি বিষয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে আছেন, সেটা কী কে বলতে পারবে?"

মামুন হাত তুলে বলল, "সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?"

"উহুঁ।" ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, "নোবেল প্রাইজ তো অনেকেই পেয়েছেন– সেটি নয়। অন্য কিছু আছে–।"

ক্লাসের সবাই মাথা চুলকাতে লাগলো তখন ম্যাডাম নিজেই বললেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একমাত্র মানুষ যার লেখা গান দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত। একটি আমাদের বাংলাদেশের, আরেকটা ভারতবর্ষের।"

আমি এটা জানতাম না, শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম।

ম্যাডাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি এটা এতো মধুর একটা গান, কিন্তু যতবার এই গানটা আমি শুনি ততবার চোখে পানি এসে যায়।"

মৌটুসি জিজ্ঞেস করল, "কেন ম্যাডাম?"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "জানি না কেন, মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছোট ছিলাম, প্রতিদিন এই গানটা শুনতাম আর ভাবতাম কবে আমাদের দেশটা স্বাধীন হবে, সেইজন্যে এই গানটার জন্যে আমাদের মতো মানুষের অন্য রকম একটা মায়া।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশে কী হয়েছিল তোমরা জানো?"

অনেকে বলল, "জানি।" কয়েকজন বলল, "না জানি না।" বাকিরা চুপ করে রইল। আমাদের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে কথাবার্তা লেখা আছে তার অনেকগুলো নাকী ভুয়া। প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে সেটা জিজ্ঞেস করলে হতো কিন্তু আমি ক্লাসে কখনো কোন স্যার-ম্যাডামকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। খারাপ ছেলে হিসেবে একবার পরিচয় হয়ে যাবার পর আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশে অনেক কিছু হয়েছিল, কিন্তু কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি হয়েছিল আমি কী বলব জানো?"

ক্লাসের প্রায় সবাই জিজ্ঞেস করল, "কী ম্যাডাম?"

"দুঃখ।" প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তখন এই দেশে এমন একটি পরিবার ছিল না যাদের কোন না কোন আপনজন মারা যায় নি। এই দেশের প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা মানুষকে সেই মুক্তিযুদ্ধ স্পর্শ করেছিল।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি একজন মাকে জানি যার ছেলেকে পাকিস্তান মিলিটারিরা মেরে ফেলেছিল। সেই মা তারপর থেকে যতদিন বেঁচে ছিল কোন দিন ভাত খায় নি, মৃত্যুর আগে ছেলেটা ভাত খেতে চেয়েছিল, তার জন্যে রান্না করে তার মা ভাত পাঠিয়েছিলেন, সেই ছেলেটা সেই ভাত খেতে পারে নি, সেজন্যে।"

ঠিক কী কারণ জানি না আমার তখন হঠাৎ আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। এখন যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় হতো আর আমি যদি মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে পাকিস্তান মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে যেতাম আর পাকিস্তান মিলিটারি যদি আমাকে টর্চার করতো সেই খবরটা শুনে আম্মু কী করতেন? খুশি হতেন?

বিষয়টা চিন্তা করতে করতে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। হঠাৎ শুনলাম জহুরুল দাঁড়িয়ে বলছে, "আমার বড় চাচা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।" তারপর ইশতিয়াক দাঁড়াল, সে বলল, "আমাদের পাশের বাসায় একজন মুক্তিযোদ্ধা থাকেন।" নাঈমা বলল, "আমার আগের স্কুলের অঙ্ক স্যার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম নিশ্চয়ই সবার কাছে জানতে চাইছেন ক্লাসের ছেলে মেয়েদের পরিচিত কেউ মুক্তিযোদ্ধা আছে কীনা। অনেকেই বলল, আমিও ভাবলাম আমিও বলি যে আমার আব্বু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু আমি কিছু বললাম না। কেউ প্রশ্ন না করলে নিজে থেকে কিছু বলার বিষয়টি আমি ভুলেই গিয়েছি।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে যারা বেঁচে আছে এখন যদি তাদের দেখো দেখবে তাদের চুল পেকে গেছে। তাদের বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় মারা গেছে তাদের কারো বয়স হয়নি, তাদের বয়সটা সতেরো আঠারো উনিশ বছরে আটকে গেছে। তারা আর কোন দিন বুড়ো হবে না, তারা অনন্তকাল কিশোর থাকবে। তরুণ থাকবে। কী আশ্চর্যের একটা ব্যাপার, তাই না?"

আমরা কেউই ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করি নাই। সত্যিই তো একজন মানুষ যখন কম বয়সে মারা যায় তখন তার তো আর বয়স বাড়ে না। সে তো সারাজীবনই কম বয়সী থেকে যায়! মানুষটি বেঁচে থাকে না কিন্তু তার স্মৃতিটা বেঁচে থাকে। কী সাধারণ একটা ব্যাপারকে ইচ্ছে করলেই কী অসাধারণ ভাবে দেখা যায়। আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, মনে হতে লাগলো আমাদেরকে দেখেও দেখছেন না। মনে হতে লাগলো অনেক দূরে কোথাও তাকিয়ে আছেন। খানিকক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "তোমাদেরকে একজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প বলি। সত্যি গল্প।

"একাত্তর সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন ছেলেটা পড়ে ক্লাস টেনে। স্কুলের ছাত্র, তোমাদের থেকে দুই এক বছর বেশি বয়স হবে। এত ছোট ছেলের তো যুদ্ধে যাবার কথা না কিন্তু তবু সে বাসা থেকে পালিয়ে চলে গেলো যুদ্ধে।

"তার একটি ছোট বোন ছিলো, পিঠাপিঠি ভাই-বোন তাই দুজনে শুধু ঝগড়া করতো। সত্যিকারের ঝগড়া না, পিঠাপিঠি ভাইবোনের ঝগড়া। কে মশারি টানাবে সেটা নিয়ে ঝগড়া। বইয়ের মলাট কে ছিঁড়ে ফেলল সেটা নিয়ে ঝগড়া, গল্প বই কে আগে পড়বে সেটা নিয়ে ঝগড়া।

"ভাইটি যে রাতে বাসা থেকে পালিয়ে যুদ্ধে চলে গেলো সেদিনও বোন তার সাথে ঝগড়া করেছিল, একেবারে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া। তার প্রিয় কলমের নিব ভোঁতা করে ফেলা নিয়ে ঝগড়া। বোনটা তো আর জানতো না যে তার ভাই সেই রাতে যুদ্ধে চলে যাবে, তাহলে নিশ্চয়ই সে রাতে আর ঝগড়া করতো না।

"যাই হোক, ছোট ছেলে অনেক কষ্ট করে বর্ডার পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়েছে। এত ছোট ছেলে, কেউ তাকে যুদ্ধে নিতে চায় না, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দলে ঢুকে পড়ল। তাদের সাথে ট্রেনিং নিয়ে সে দেশের ভেতরে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে।

"আস্তে আস্তে দিন পার হতে থাকে। প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল পাকিস্তান মিলিটারিদের বুঝি কেউ হারাতে পারবে না, কিন্তু যতই দিন যেতে শুরু করেছে ততই বোঝা যেতে শুরু করেছে এই দেশে তাদের দিন একেবারে হাতেগোনা। আগে যেখানে পাকিস্তান মিলিটারির ভয়ে কেউ ঘর থেকে বের হতো না, সেসব জায়গাতেও রাত্রি বেলা গেরিলা বাহিনী এসে আক্রমণ করে বসে।

"এ রকম সময় সেই ছেলেটা তার দলের সাথে কাছাকাছি একটা এলাকায় এসেছে। কয়েকটা গেরিলা অপারেশান করে দলটি যখন ফিরে যাবে তখন ছেলেটা তার দলের কমান্ডারের কাছে বলল সে এক রাতের জন্যে তার বাসায় গিয়ে মা আর বোনের সাথে দেখা করতে চায়। কমান্ডার প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না, শেষে ছোট ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মায়া হলো, তিনি অনুমতি দিলেন।

"গভীর রাতে ছেলেটা তার বাসায় এসেছে। দরজায় টুকটুক শব্দ করছে, ঘুম ভেঙে মা অবাক হয়ে ভাবলেন, এতো রাতে অসময়ে কে এসেছে? দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "কে?"

"ছেলেটা ফিসফিস করে বলল, "আমি, মা।" মা দরজা খুলে ছেলেটাকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে সে কী কান্না। শুধু শরীরে হাত বুলান আর ফিসফিস করে বলেন, "তোর শরীরে কোথাও গুলি লাগে নি? কোথাও গুলি লাগে নি?"

"ছেলেটা হাসে আর বলে, "মা, গুলি লাগলে আমি তোমার কাছে এলাম কেমন করে?"

"এতো রাতে কথাবার্তা শুনে বোনটিও জেগে উঠেছে। ভাইকে দেখে কী অবাক। তার এইটুকুন ভাই, এখন তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া উষ্কখুষ্ক চুল, রোদে পোড়া চেহারা, পিঠে ছোট স্টেনগান, একেবারে সত্যিকারের যোদ্ধা! ভাই বোনকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কী এখনো আমার ওপর রাগ করে আছিস? দেশ স্বাধীন হোক তখন আমি তোকে এক ডজন কলম কিনে দেব!"

"তার কথা শুনে বোনটি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। ভাইটি তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ধুর বোকা মেয়ে কাঁদিস না। দেখিস, দেখতে দেখতে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে- পাকিস্তানিরা পালিয়ে যাবার জায়গা পাবে না।" বোনটা তখন লাজুক মুখে বলল, "ভাইয়া আমি আমার সোনার বাংলা গানটা তুলতে পারি- হারমোনিয়ামে তোমাকে বাজিয়ে শোনাব?" ভাইটি বলল, "এতো রাতে সেটা বাজালে আশেপাশে সন্দেহ করতে পারে- যখন দেশ স্বাধীন হবে তখন তুই বাজিয়ে শোনাবি। ঠিক আছে?"

"এদিকে মা দৌড়াদৌড়ি করে রান্না বসিয়েছেন। ছেলের জন্যে গরম ভাত আর শিং মাছের ঝোল। ছেলের খুব প্রিয় খাবার শিং মাছ। রান্না যখন শেষের দিকে তখন হঠাৎ বাসার চারপাশে ধুপধাপ শব্দ, মানুষজন দৌড়াদৌড়ি করছে। ছেলেটি হাতের স্টেনগান হাতে নিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "মা, আমাকে যেতে হবে।"

"মা ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "কেন বাবা কী হয়েছে?"

"ছেলে বলল, "রাজাকাররা বাসা ঘিরে ফেলেছে। আমাকে যদি বাসার ভেতরে পায় তোমাদের খুব বড় বিপদ হবে মা।" মা ফিসফিস করে খোদাকে ডেকে বললেন, "ইয়া মাবুদ ইয়া পরওয়ার দিগার, আমার ছেলেকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি তাকে রক্ষা করো-"

"ছেলে মাকে কদমবুসি করে বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে স্টেনগান হাতে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

"প্রথমে কোন শব্দ নেই, তারপর হঠাৎ কয়েকজন মানুষের চিৎকার শোনা গেলো তারপর গুলির শব্দ। রাইফেল আর স্টেনগানের গুলি তারপর কোন শব্দ নেই। মা আর বোন জানালার পর্দা তুলে বাইরে তাকাল, দেখলো রাস্তার মাঝখানে কে যেন পড়ে আছে।

"কিছু বোঝার আগে ছোট বোনটি দরজা খুলে অন্ধকারে ছুটে গেলো, গিয়ে দেখলো রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার ভাই। বোনটি খুব ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ভাইটির মাথাটি বুকে তুলে নিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, "ভাই।"

"ভাইটি তখন চোখ খুলে তাকালো। রাত্রের আবছা অন্ধকারে দুই ভাই-বোন তখন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাইটি তখন ফিসফিস করে কিছু একটা বলল, বোনটি শুনতে পেলো না। তাই সে মাথাটা আরো নিচু করে নিলো, শুনলো ভাই ফিসফিস করে বলছে, "তুই আমাকে সোনার বাংলা গানটা শুনাবি?"

"বোন তখন তার চোখ মুছে তার ভাইয়ের মাথাটা কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে আমার সোনার বাংলা গানটি গাইতে লাগলো। আস্তে আস্তে চারিদিক থেকে রাজাকাররা তাকে ঘিরে ফেলছিল কিন্তু সে তবু গানটি বন্ধ করল না। বোনটি গাইতেই লাগলো- গাইতেই লাগলো।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডামের গলা ধরে এলো। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "মেয়েটির যখন গানটি শেষ হয়েছে তখন তার ভাইটি আর বেঁচে নেই। রাজাকাররা তাদের দুজনকে ঘিরে রেখেছিল কিন্তু কাছে আসতে সাহস পাচ্ছিল না। বোনটি তার ভাইয়ের মাথাটা কোলে নিয়ে বসেই রইল। বসেই রইল।"

আমাদের কেউ বলে দেয় নি কিন্তু আমরা সবাই জানি সেই বোনটি হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। আমরা তার দিকে তাকিয়ে সেই ছোট মেয়েটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

pathfinder

চোর

বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়াটা আরও কয়েকদিনের জন্যে পিছিয়ে দিতে হলো। স্কুল থেকে আমাকে টি.সি. দিয়ে বের করে দেয়া হবে না সেটা আমি বুঝে গেছি। সেদিন যখন স্কুল ছুটি হবার পর বাসায় ফিরে যাচ্ছি তখন প্রিয়াংকা আমার কাছে ছুটে এসে বলল, "তপু।"

আমি বললাম, "কী?"

"তুই দেখলি কী হলো?"

অনেক দিন পর কেউ একজন আমার সাথে তুই তুই করে কথা বলল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম একজন যখন আরেকজনের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলে তখন কেমন লাগে। আমি আমার অবাক হওয়াটা গোপন রেখে বললাম, "কেন কী হয়েছে?"

"তুই প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে কী বলেছিলি মনে আছে?"

"কী?"

"রাজাকার স্যার রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ান না, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে টিটকারি মারেন—"

আমার মনে পড়ল, বললাম, "ও, হ্যাঁ মনে আছে।"

"প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ঠিক এগুলি নিয়ে কথা বলেছেন। রাজাকার স্যার দশ বছর ধরে যে সর্বনাশ করার চেষ্টা করেছেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এক ঘণ্টায় সেটা ঠিক করে দিলেন।" প্রিয়াংকা আনন্দে দাঁত বের করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমার দিকে তাকিয়ে অনেকদিন কেউ হাসে নি, আমার কাছে বিষয়টা এমন বিচিত্র মনে হলো যে আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রিয়াংকা বললাম, "তোর কী হলো? এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?"

আমি বলল, "না কিছু হয় নাই।"

প্রিয়াংকা বলল, "প্রিন্সিপাল ম্যাডামের জন্যে কিছু একটা করতে হবে।"

আমি বললাম, "কী করবে?" বলতে চেয়েছিলাম "কী করবি?" কিন্তু বলতে পারলাম না। কীভাবে কীভাবে জানি নিজের চারিদিকে একটা দেওয়াল তুলে ফেলেছি, কারো সাথে সহজ হতে পারি না।

প্রিয়াংকা বলল, "এখনও ঠিক করি নাই। চিন্তা করছি।"

প্রিয়াংকা মনে হয় চিন্তা করতে করতেই ব্যাগ ঝুলিয়ে চলে গেলো। আমিও স্কুল থেকে বের হয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। অন্ধকার হবার আগে আমি কখনো বাসায় ফিরে যাই না।

সেদিন রাত্রিবেলা আমি একটা বিচিত্র কাজ করলাম। স্টোররুমে আমার বিছানায় গুটিশুটি মেরে বসে আমাদের বাংলা বইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাটা মুখস্থ করে ফেললাম। মোটামুটি বড় কবিতা কিন্তু দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে গেলো। আমি যখন মনে মনে কবিতাটা আবৃত্তি করছি ঠিক তখন নেংটি ইঁদুরটা দরজার চৌকাঠের অন্যপাশ থেকে আমার দিকে উঁকি দিল। আমি মেঝেতে আঙুল দিয়ে ঠোকা দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "এই মিচকি! এই!"

নেংটি ইঁদুরটা আমার দিকে এগিয়ে এলো, আমি আমার পকেট থেকে ছোট ছোট রুটির টুকরো বের করে কাছাকাছি ছড়িয়ে দিলাম। নেংটি ইঁদুরটা একটু দূর থেকে সাবধানে আমাকে লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে কাছে এসে একটা রুটির টুকরো সাবধানে সরিয়ে নিয়ে কুটুর কুটুর করে খেতে থাকে। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "এই মিচকি? তোর কী কবিতা ভাল লাগে?"

নেংটি ইঁদুরটা আমার কথার উত্তর না দিয়ে তার দ্বিতীয় টুকরোটার জন্যে এগিয়ে এলো। আমি ফিসফিস করে বললাম, "শুনবি কবিতাটা?" নেংটি ইঁদুরটা তার মাথা তুলে সাবধানে আমার দিকে তাকালো, আমি সেটাকেই সম্মতির চিহ্ন হিসেবে ধরে নিয়ে বললাম, "তাহলে শোন।"

আমি তারপর ফিসফিস করে কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাতে থাকি। ডাইনিংরুমে তখন আম্মু আপু আর ভাইয়াকে নিয়ে খাচ্ছে। দুলি খালা টেবিলে খাবার নিয়ে যাচ্ছে, ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করছে। আমি সবকিছুকে ভুলে গিয়ে আমার নেংটি ইঁদুরকে ফিসফিস করে কবিতা শোনাতে লাগলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে দেখলে খুব অবাক হতেন নিশ্চয়ই!

নেংটি ইঁদুরটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমি আমার হাতের তালুতে তুলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সে রাজি হলো না। হাতের আঙুলগুলোর কাছাকাছি এসে সাবধানে গন্ধ শুঁকে এমন একটা ভাব করলো যে তার গন্ধটা পছন্দ হয় নি,

তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেলো। এই নেংটি ইঁদুরের সময়ের জ্ঞান খুব বেশি, তার হাবভাব দেখেই মনে হচ্ছে কোথাও একটা জরুরি এপয়েন্টমেন্ট আছে, তাকে এখনই চলে যেতে হবে!

নেংটি ইঁদুরটা চলে যাবার পর আমি কিছু করার নেই বলে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এখন মে মাস, ভ্যাপসা গরম। এই স্টোররুমের বিছানায় শুয়ে আমি এপাশ-ওপাশ করতে থাকি। আমার যখন ঘুম আসে না তখন আমি মাথার ভেতরে কোন একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি, তখন সময়টা বেশ কেটে যায়। ঘড়িতে ঠিক তখন সাড়ে দশটা বাজার একটা ঘণ্টা বাজলো তখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম কতক্ষণ পর পর ঘড়ির ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা ঠিক এক জায়গায় এসে হাজির হয়। ঘণ্টার কাঁটা প্রতি মিনিটে আধা ডিগ্রি যায় মিনিটের কাটা যায় ছয় ডিগ্রি। প্রথমবার ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা এক জায়গায় থাকে ঠিক বারোটার সময়। এর পরের বার ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা এক জায়গায় আসবে একটা বেজে সাড়ে পাঁচ মিনিটের দিকে। মিনিটের সঠিক সংখ্যাটা হচ্ছে ত্রিশকে সাড়ে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটা। প্রতি ঘণ্টার পর এই সংখ্যার সমান সংখ্যক মিনিট সরে যেতে হবে– সমস্যাটা আসলে একেবারে কঠিন না। একেবারে পানির মতো সোজা। সময় কাটানোর জন্যে আমার আরো কঠিন একটা সমস্যা দরকার।

একটা সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর মাঝখানে যদি বাহুর তিন ভাগের এক ভাগ সমান একটা ত্রিভুজ বসানো হয় তাহলে কেমন হয়? সেই ত্রিভুজের মাঝখানে আরেকটা ছোট ত্রিভুজ, তার মাঝখানে আরেকটা এভাবে যদি বসানোই হতে থাকে তাহলে যে জিনিসটা তৈরি হবে তার পরিসীমা কতো? তার ক্ষেত্রফলইবা কতো? কিছুক্ষণের মাঝেই সমস্যাটা আমি মাথার মাঝে করে ফেললাম কিন্তু যে উত্তরটা পেলাম সেটা হলো খুব অদ্ভুত। ক্ষেত্রফল সসীম কিন্তু পরিসীমা অসীম। কী আশ্চর্য!

আমি বিছানা থেকে উঠে বসলাম, এটা একটা ভাল সমস্যা। এর পিছনে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যায়। সমস্যাটা মাথার মাঝে করে ফেলা গেছে কিন্তু এটা সত্যি কীনা বোঝার জন্যে কাগজ-কলম লাগবে। আমি উঠে বসে আমার একটা খাতা আর কলম নিয়ে হিসেব করতে লাগলাম। ঠিক যখন মাঝামাঝি এসেছি আর দুটি লাইন করলেই পরিসীমাটি পেয়ে যাই তখন আমার বল পয়েন্ট কলমের কালিটা শেষ হয়ে গেল! আমার এতো মেজাজ খারাপ হলো যে বলার মতো নয়– ইচ্ছে হলো কলমটাকে কামড়ে খেয়ে ফেলি! কিন্তু বল পয়েন্ট কলম কামড়ে খেয়ে ফেললেও তো সেটা থেকে লেখা বের হবে না!

আমি আমার কাগজগুলো নিয়ে ছটফট করতে লাগলাম, সমস্যাটা শেষ করার জন্যে হাত নিশপিশ করতে লাগলো। ভাইয়া কিংবা আপুর কাছ থেকে একটা কলম চেয়ে আনা যায়, কিন্তু আম্মুর চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! সবাই ঘুমিয়ে যাবার পর খুব সাবধানে উঠে গিয়ে ভাইয়া কিংবা আপুর টেবিল থেকে একটা কলম নিয়ে আসা ছাড়া আর কোন সহজ উপায় নেই। তা না হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বাসা থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে অনেকদিন থেকে আমি একটু একটু করে টাকা-পয়সা জমানোর চেষ্টা করছি, সেখান থেকে দুটো টাকা নিয়ে একটা বল পয়েন্ট কলম কিনে ফেলা যাবে। কিন্তু এখন রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার সময় আমার কিছুই করার নেই।

সবকিছু ভুলে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করা যায় কিন্তু আমি ঘুমাতে পারছি না। দেখাই যাচ্ছে আমি যে জিনিসটার পরিসীমা আর ক্ষেত্রফল বের করার চেষ্টা করছি তার মাঝে একটা বিচিত্র ব্যাপার রয়েছে। এর ক্ষেত্রফল অসীম কিন্তু পরিসীমা সসীম। এটা কীভাবে হতে পারে?

বিষয়টা ভাল করে দেখার জন্যে আমার ভেতরটা আঁকুপাকু করতে লাগলো। আমার দরকার একটা কলম বা পেন্সিল। আমি আমার বিছানা কাগজপত্র ভাল করে উল্টেপাল্টে দেখলাম, কোথাও আরেকটা কলম কিংবা পেন্সিল নাই। বহুদিন থেকে লেখাপড়া করি না, তাই থাকার কথাও না। কী করব বুঝতে না পেরে শুয়ে শুয়ে আমি ছটফট করতে লাগলাম।

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বাসার সব আলো নিভে গেল, তার মানে সবাই শুয়ে পড়েছে। তারপর আমি আরো কিছুক্ষণ সময় দিলাম, যখন মনে হলো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন আমি সাবধানে আমার বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে ভাইয়ার ঘরের সামনে হাজির হলাম। খুব সাবধানে দরজাটা একটু খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার, কোন কিছু দেখা যায় না। বাম পাশে বিছানায় ভাইয়া ঘুমাচ্ছে, পাশে টেবিলে তার বই খাতাপত্র। টেবিলের উপরে নিশ্চয়ই কলম পেন্সিল ছড়ানো থাকবে সেখান থেকে হাতড়ে একটা কলম খুঁজে নিতে হবে। আমি টেবিলের উপর হাত দিলাম, বই, কিছু কাগজ, গানের সিডি এরকম জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিন্তু কোন কলম বা পেন্সিল নেই। আমি দুই পাশে হাত বুলাতে থাকি, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ করে হাত লেগে কিছু একটা পড়ে গেলো, টেবিল থেকে গড়িয়ে সেটা মেঝেতে পড়ে সশব্দে ভেঙে যায়।

আমার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ করে যেন থেমে গেলো। বিছানায় লাফ দিয়ে ভাইয়া উঠে বসেছে, ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠেছে, "কে?"

আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। উপায় না দেখে ফিসফিস করে কাতর গলায় বললাম, "ভাইয়া, আমি তপু।"

ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, "তপু!"

ততক্ষণে সর্বনাশ যেটা হবার সেটা হয়ে গেছে, পাশের ঘর থেকে আম্মু জিজ্ঞেস করেছেন, "রাজীব, কী হয়েছে?"

ভাইয়া বলল, "কিছু না আম্মু।"

"কার সাথে কথা বলিস?"

ভাইয়া ইতস্তত করে বলল, "তপুর সাথে।"

পাশের ঘরে আম্মু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর আমি শুনতে পেলাম বিছানা থেকে নামছেন। আলো জ্বালালেন তারপর দরজা খুলে ভাইয়ার ঘরে এসে ঢুকলেন। ভাইয়ার ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন। তীব্র আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। স্টোররুমে হঠাৎ করে আলো জ্বালালে তেলাপোকাগুলো যেমন কোথায় গিয়ে পালাবে বুঝতে পারে না, আমার অবস্থা হলো ঠিক সেরকম। আম্মুর সামনে আমি জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, নিজেকে নিয়ে কোথায় লুকাবো আমি বুঝতে পারছিলাম না। এক পলকের জন্যে আম্মুর দিকে তাকিয়ে আমি মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রইলাম, আম্মুর চোখ ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে।

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এখানে কী করছিস?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। কিছু না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকাই মনে হয় সবচেয়ে নিরাপদ।

আম্মু আরও এক পা এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এসেছিস এখানে?" আম্মু নিচের দিকে তাকালেন, আমার হাতে লেগে টেবিলে রাখা গ্লাসটা পড়ে ভেঙ্গে গেছে। শুধু যে গ্লাসটা ভেঙ্গেছে তা নয়, পানি পড়ে টেবিলে রাখা ভাইয়ার বই-কাগজপত্রও একটু ভিজে গেছে।

আম্মু আরও এক পা এগিয়ে এসে খপ করে আমার চুল ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেন, হিংস্র গলায় বললেন, "কী করতে এসেছিস এই ঘরে?"

আমি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বললাম, "একটা কলম নিতে এসেছিলাম।"

আম্মু আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "কলম নিতে এসেছিস? কলম?"

আমি মাথা নাড়লাম। আম্মু গলায় বিষ ঢেলে বললেন, "আমার জ্ঞানের সাগর আইনস্টাইন রাত দুপুরে এসেছেন কলম চুরি করতে! আমার সাথে তুই ইয়ারকি মারতে এসেছিস? তুই ভাবছিস আমি জানি না তোর পড়াশোনার নমুনা? তুই কয় সাবজেক্টে পাস করিস আর কয় সাবজেক্টে ফেল করিস আমি সেটা জানি না ভেবেছিস?"

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আম্মু এদিক সেদিক তাকিয়ে চেয়ারে রাখা ভাইয়ার প্যান্ট থেকে তার বেল্টটা খুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। চিৎকার করে বললেন, "সত্যি করে বল কেন এসেছিস? কী চুরি করতে এসেছিস?"

কথা শেষ করার আগেই বেল্টটা দিয়ে আম্মু সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে আমাকে মারলেন, মনে হলো আমার চামড়া কেটে বেল্টটা শরীরের ভেতর ঢুকে গেলো। যন্ত্রনায় আমি নিজের অজান্তেই কেঁদে উঠলাম।

আমাকে কাঁদতে দেখে আম্মু মনে হয় আরো খেপে উঠলেন, বেল্টটা দিয়ে আমাকে নির্মমভাবে আরো কয়েকবার মেরে বললেন, "বল তুই কী করতে এসেছিস? বল জানোয়ারের বাচ্চা জানোয়ার।"

আমার কান্না আর আম্মুর চিৎকার শুনে ভাইয়া তার বিছানা থেকে নেমে এসেছে, আপুও তার ঘর থেকে চলে এসেছে। দুলি খালাও বের হয়ে এসেছেন। সবাই নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কেউ আমাকে বাঁচাতে এলো না। গরমের জন্যে আমার খালি গা, ময়লা খাটো একটা পায়জামা পরে আছি, ঠিকমতো গোসল করতে পারি না বলে গায়ে ময়লা, একমাথা ময়লা চুলে আমাকে নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে হতচ্ছাড়া একজন মানুষের মতো। আমি জানি আমাকে দেখে কারো ভেতরে কোন মায়া হচ্ছে না, কোন করুণা হচ্ছে না– সবার ভিতরে এক ধরনের বিতৃষ্ণা হচ্ছে, ঘেন্না হচ্ছে। একটা ঘেয়ো কুকুরকে যখন কেউ লাথি মারে, সেটা কেঁউ কেঁউ শব্দ করে পালিয়ে যায়, তখন সেই কুকুরটার জন্যে যেরকম মায়া হয় না, ঠিক সেরকম আমার জন্যেও কারো মায়া হচ্ছে না। আমার নিজেকে এতো ছোট, এতো জঘন্য মনে হতে লাগলো যে ইচ্ছে হলো মাটির তলায় ঢুকে যাই।

এক সময় আপু এগিয়ে এসে শুকনো গলা বলল, "আম্মু তপু হয়তো আসলেই একটা কলমের জন্যে এসেছে। একটা কলম দিয়ে দাও। তারপর শুতে চলো। এতো চেঁচামেচি করলে তোমার শরীর খারাপ করবে।"

আম্মু চিৎকার করে বললেন, "তুই এই বদমাইশটার কথা বিশ্বাস করছিস? তুই জানিস এই বদমাইশটা একটা চোর? চুরি করতে এসেছে–"

আপু বলল, "থাকুক আম্মু–"

আম্মু বললেন, "কেন থাকবে? একটা চোরকে আমি বাসায় পালব?"

আপু কী বলবে বুঝতে পারল না, ঘুম ঘুম চোখে একটা হাই তুলে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। আম্মু বললেন, "আমি লিখে দিতে পারি এই বদমাইশটার ঘর সার্চ করলে বের হবে এটা কী কী জিনিস চুরি করে–"

আপু আবার বলল, "থাকুক আম্মু।"

আম্মু বললেন, "তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না? আয় আমার সাথে।" তারপর আমার চুল ধরে হিড়হিড় করে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন আমার স্টোর রুমে। আমার ময়লা তোষকটা তার হাত দিয়ে ধরতে ঘেন্না হলো তাই পা দিয়ে সেটা ওল্টাতে শুরু করলেন। পালিয়ে যাবার জন্যে আমি অনেক দিন থেকে টাকা জমিয়ে যাচ্ছি- সত্যি কথা বলতে কী তার অনেকটুকু আমি আসলেই চুরি করেছি। কেউ যেন বুঝতে না পারে সেভাবে, অল্প অল্প করে। কখনো ভাইয়ার পকেট থেকে, কখনো আপুর ব্যাগ থেকে। বাসায় যখন কেউ নেই তখন ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে। এই সবগুলো টাকা আমি ঘরের কাগজে মুড়ে বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখেছি, আম্মু পা দিয়ে সেটা বের করে ফেললেন। সাথে সাথে তার সারা মুখ আনন্দে চকচক করতে থাকে, ভাইয়া আর আপুকে ডেকে বললেন, "দেখলি? দেখলি তোরা? আমি বলেছিলাম না এ চোর? দেখেছিস?"

আপু আর ভাইয়া একবার টাকাগুলি দেখলো তারপর আমার দিকে তাকালো। আপু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ছিঃ! তপু। ছিঃ!" আপুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো আমি যেন এখনি মরে যাই।

আম্মু টাকাগুলো হাতে তুলে নিলেন, তারপর বেল্টটা হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু দেখতে পেলাম। আম্মু যখন আমার আমাকে মারতে শুরু করলেন আমি বৃথাই আমার হাত দিয়ে আমার মুখটা বাঁচাতে চেষ্টা করলাম।

দুলি খালা শেষ পর্যন্ত যদি আমাকে সরিয়ে না নিতেন তাহলে আম্মু মনে হয় সত্যিই শেষ পর্যন্ত আমাকে মেরে ফেলতেন। আমি প্রথমে কিছুক্ষণ চিৎকার করেছি, কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই আমি আর চিৎকার করতে পারছিলাম না। আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম, গলা দিয়ে গোঙ্গানোর মতো এক ধরনের শব্দ বের হতে লাগলো। আপু আর ভাইয়া অনেকবার এই দৃশ্য দেখেছে তারা কাছাকাছি বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু দুলি খালা একসময় আর সহ্য করতে পারল না, আম্মুকে ঠেলে একরকম জোর করে আমাকে সরিয়ে নিল।

পরদিন আমার সারা শরীর ফুলে গেলো। জায়গায় জায়গায় রক্ত নীল হয়ে জমে আছে। তার সাথে গা কাঁপিয়ে জ্বর। আমি আমার ময়লা তোষকের উপর

গুটিশুটি মেরে শুয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। জ্বরের ঘোরে আমি বিচিত্র সব জিনিস স্বপ্নে দেখতে লাগলাম, কখনো দেখলাম আম্মু একটা বিশাল কিরিচ নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছেন, আম্মুর চুলে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে আর আম্মু হা হা করে হাসছেন, তার মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। কখনো দেখলাম পাগলা কুকুর আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়ছে, আঁচড়ে-কামড়ে আমাকে ছিঁড়ে ফেলছে। আবার কখনো দেখলাম একটা বড় ত্রিভুজকে ঘিরে অনেকগুলো ছোট ত্রিভুজ, তাদের ঘিরে আরো অনেকগুলো ছোট ত্রিভুজ। সেগুলো কখনো বড় হচ্ছে কখনো ছোট হচ্ছে কখনো ঘুরছে কখনো নড়ছে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি এই ক্ষেত্রটির পরিসীমা বের করতে। পারছি না, আর পারছি না বলে যন্ত্রণায় ছটফট করছি।

জ্বরের ঘোর থেকে মাঝে মাঝে আমি জেগে উঠেছি, জেগে উঠে আমি দেখেছি স্টোররুমের অন্ধকার কোনায় আমি শুয়ে আছি। আমার বুকটা খাঁ খাঁ করছিলো একটুখানি স্নেহের কথার জন্যে একটুখানি মমতার কথার জন্যে। শুধু মনে হচ্ছিল, আহা, কেউ যদি আমার কপালে হাত রেখে বলতো, "তপু, এখন কেমন লাগছে তোমার?" কিন্তু কেউ আমাকে সেটা বলল না, আমি একা একা শুয়ে রইলাম।

কেউ যে আমার কাছে এলো না সেটা সত্যি না। আমি যখন রাত্রিবেলা জ্বরের ঘোরে আধা অচেতন হয়ে পড়েছিলাম তখন হঠাৎ করে আমার হাতের মাঝে একটু সুড়সুড়ি অনুভব করলাম। চোখ খুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম নেংটি ইঁদুরটা আমার হাতটা শুঁকে সেখানে উঠে বসেছে। এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে সে আমার দিকে তাকাচ্ছে! প্রতিরাত আমি তার জন্যে রুটির টুকরো এনে রেখেছি, আজ কিছু নেই- নেংটি ইঁদুরটা মনে হয় সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি চোখ খুলে ফিসফিস করে বললাম, "মিচকি? তুই এসেছিস?"

আমার স্পষ্ট মনে হলো নেংটি ইঁদুরটা মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "তোর জন্যে কোনো খাবার আনতে পারি নি রে মিচকি! সরি। দেখছিস না আমার অবস্থা? আমার আম্মু মেরে আমাকে একেবারে ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে।"

আমার মনে হলো নেংটি ইঁদুরটা আমার কথা বুঝতে পারল। সেটা সম্মতির ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "আজকে তুই নিজে নিজে কষ্ট করে কিছু একটা খেয়ে নে। কাল তোর জন্যে খাবার আনব। ঠিক আছে?"

জ্বরের ঘোরে সবকিছু ওলটপালট হয়ে আছে, তাই আমার মনে হলো নেংটি ইঁদুরটা মাথা নাড়ল। আমি তখন অন্য হাত দিয়ে খুব আস্তে করে তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলাম, আর কী আশ্চর্য সেটা অন্যদিনের মতো

লাফিয়ে সরে গেলো না। আমি হাতটা নিচে রাখলাম তখন নেংটি ইঁদুরটা হাত থেকে নেমে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল।

আমি স্কুলে গেলাম দুইদিন পর। সারা শরীরে আব্বুর বেল্ট দিয়ে মারের চিহ্ন, সেগুলো আমি শার্ট দিয়ে ঢেকে রেখেছি। শুধু বাম গাল থেকে গলা পর্যন্ত একটা দাগ ঢেকে রাখা যায় নি। সেটা নিয়ে আমি অবশ্যি খুব বেশি ভাবছি না। আমার আব্বু যে আমাকে এভাবে মারেন সেটা কেউ জানে না। সবাই ধরে নেয় আমি পথেঘাটে মারামারি করে নিজের এ অবস্থা করি।

স্কুলে আমাকে দেখে সবাই সরে গিয়ে জায়গা করে দিলো। আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না, শুধু প্রিয়াংকা চোখ কপালে তুলে বললো, "সে কী, তোর গালে কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "কিছু না।"

আমি বলতে চাইছি না দেখে প্রিয়াংকা আর কিছু জানতে চাইল না। বলল, "তুই দুইদিন স্কুলে আসিস নি কেন?"

আমি একটু অবাক হয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকালাম, আমি স্কুলে এসেছি কী আসি নাই কেউ সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে সেটা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি আমতা আমতা করে বললাম, "শরীর খারাপ ছিল।"

"ও।" প্রিয়াংকা হড়বড় করে বলল, "তুই যা একটা ফাটাফাটি জিনিস মিস করেছিস!"

"কী জিনিস?"

"প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কালকে আবার ক্লাসে এসেছিলেন।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।" প্রিয়াংকা রহস্য করে বলল, "বল দেখি কী নিয়ে কথা বলেছেন?"

"মুক্তিযুদ্ধ?"

"উঁহুঁ।" প্রিয়াংকা দাঁত বের করে হেসে বলল, "হিন্দু-মুসলমান নিয়ে। এতো সুন্দর করে বলেছেন যে তুই শুনলে বেকুব হয়ে যেতি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলেছেন?"

"আমি কী আর ম্যাডামের মতো বলতে পারব?" প্রিয়াংকা গম্ভীর হয়ে বলল, "বলেছেন যে পৃথিবীটা সুন্দর তার বৈচিত্র্যের জন্যে। তাই যেখানে

বৈচিত্র্য বেশি সেখানে সৌন্দর্য বেশি। যেখানে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান কেউ বৌদ্ধ কেউ খ্রিস্টান এবং বাঙালি কেউ পাহাড়ি কেউ চাকমা কেউ সাঁওতাল এবং সবাই যখন মিলেমিশে থাকে আর একজন আরেকজনের বৈচিত্র্যটাকে উপভোগ করে সেটাই সবচেয়ে সুন্দর।"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি ঠিক করে বলতে পারলাম না তাই তুই বলছিস 'ও'। যদি ম্যাডামের কথা শুনতি তাহলে তোর চোখ ভিজে আসত।"

আমি আবার বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা এবারে তার মুখটা আমার কাছাকাছি এসে ষড়যন্ত্রীর মতো করে বলল, "প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেন হিন্দু-মুসলমান নিয়ে কথা বলছেন, বল দেখি?"

আমি বললাম, "কেন?"

"তোর জন্যে! তুই যে রাজাকার স্যারের কথা বলে দিয়েছিলি মনে আছে? ক্লাসে হিন্দু ছেলেমেয়েদের পেটাতেন–"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা বিরক্ত হয়ে বলল, তোর হয়েছেটা কী? তোকে যেটাই বলি তুই বলিস, ও!"

আমি একটু লজ্জা পেলাম, বললাম, "না মানে ইয়ে–"

"তুই কী অন্য কিছু ভাবছিস?"

আমি আসলে অন্য কিছু ভাবছিলাম না, প্রিয়াংকা কী বলছে সেটাই খুব মন দিয়ে শুনছিলাম, কিন্তু আমার সমস্যা হলো মানুষের সাথে কতা না বলতে বলতে আমি আজকাল আর ঠিক করে কারো সাথে কথা বলতে পারি না। কেউ কিছু বললে তার উত্তরে "ও" "তাই নাকী" "আচ্ছা" এই রকম কথাবার্তা ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। কিন্তু প্রিয়াংকাকে সেটা বলতে আমার লজ্জা করল, তাই বললাম, "হ্যাঁ আসলে একটা জিনিস ভাবছিলাম তো–"

"কী জিনিস?"

"মানে– ইয়ে একটা অঙ্ক।"

"অঙ্ক?" প্রিয়াংকা চোখ কপালে তুলে বলল, "কী রকম অঙ্ক?"

"ইয়ে একটা সমবাহু ত্রিভুজের তিন বাহুর মাঝখানে যদি আরো তিনটা ছোট সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা যায়–" আমি প্রিয়াংকাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম সে ঠিক বুঝতে পারল বলে মনে হলো না। তখন খাতা বের করে পুরোটা এঁকে বললাম, "এই যে ক্ষেত্রটা দেখছ এটা খুব বিচিত্র খুব একটা ক্ষেত্র।"

"কেন?"

"আমি যদি তোমাকে বলি একটা কলম দিয়ে এর পরিসীমাটা আঁকো তুমি পারবে না। পৃথিবীর সমস্ত কলম দিয়ে আঁকার চেষ্টা করলেও পারবে না, কারণ এর পরিসীমা হচ্ছে অসীম। ইনফিনিটি!"

প্রিয়াংকা বলল, "তাই নাকী?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোমাকে যদি বলি এর ভেতরের ক্ষেত্রফলটা রং করে দাও তাহলে তুমি একটা কলম দিয়ে ঘষে ঘষে রং করে ফেলতে পারবে। ক্ষেত্রফল হচ্ছে সসীম কিন্তু পরিধি হচ্ছে অসীম- কী অদ্ভুত দেখেছ?"

বিষয়টা যে খুব অদ্ভুত সেটা প্রিয়াংকা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে নি। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে তাকে বোঝাতে হলো। যখন সত্যি সত্যি বুঝতে পারল তখন সে এতো অবাক হলো বলার মতো নয়। একটু পরে পরে বলতে লাগলো, "এটা কেমন করে সম্ভব?" "এটা কেমন করে সম্ভব?"

আমি বললাম, "খুব সম্ভব। তুমি নিজেই দেখছ।"

প্রিয়াংকা খানিকক্ষণ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোর অঙ্ক করতে খুব ভাল লাগে?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "তা তো জানি না।"

"তুই বড় হয়ে গণিতবিদ হবি?"

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, "ধুর!"

প্রিয়াংকা ভাবল আমি বিনয় করছি, কিন্তু আমি যে দুই একদিনের মাঝে বাসা থেকে সারা জীবনের মতো পালিয়ে যাব কেউ আর আমার খোঁজ পাবে না সেটা আর বললাম না। বড় জোর একটা বেদে হয়ে পথেঘাটে সাপের খেলা দেখাব। আমার জীবনে এর থেকে বেশি আর কী হতে পারে? আমি জানি আমার কপালে এটা সিল মেরে লিখে দেওয়া আছে।

পলাতক

বাসা থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে অনেক কষ্টে একটু একটু করে টাকাগুলো জমিয়েছিলাম, আমার তোষকের তলায় সেগুলো পেয়ে আম্মু নিয়ে গেছেন। আম্মু ধরে নিয়েছেন সেগুলো আমি চুরি করে এনেছি আর সেদিন রাত্রে ভাইয়ার রুমেও গিয়েছিলাম চুরি করতে। আম্মুর সন্দেহ পুরোপুরি মিথ্যা না আর সেটা চিন্তা করে আমি নিজের ভিতরে নিজে কেমন যেন ছোট হয়ে গেছি। আমার মনটা আসলে ভেঙ্গে গেছে, সত্যি সত্যি আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে আমি আসলে খারাপ ছেলে, আমি চোর। শুধু যে নিজেকে চোর মনে হয় তা না আমি কেমন যেন ভীতু হয়ে গেছি। আম্মুর হাতে সেদিন ওরকম মার খেয়ে আমার ভিতরে কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে। যতক্ষণ বাসায় থাকি স্টোররুমে গুটিগুটি মেরে বসে থাকি, বাসার ভিতরে কোথাও আম্মুর গলার স্বর শুনলেই কেমন জানি চমকে উঠি। বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হয়ে যায়।

বাসা থেকে বের হলে আমি খানিকটা সাহস পাই। স্কুলে এলে খুব খারাপ লাগে না। প্রিয়াংকা মেয়েটা অনেকটা ম্যাজিকের মতো- আমার মতো খারাপ ছেলের সাথেই সে কথাবার্তা বলে তাহলে অন্যদের সাথে তার কেমন বন্ধুত্ব হয়েছে সেটা আন্দাজ করা যায়। প্রিয়াংকার দেখাদেখি অনেক মেয়েই এখন সাহস করে ক্লাসের যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসে যায়। মেয়েদেরকে সামনে বসতেই হবে সেই নিয়মটা আর নেই। রাজাকার স্যারের সেইটা নিয়ে মেজাজ খারাপ, কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। আমাকে টি.সি. দিয়ে বিদায় করতে পারেন নাই সে জন্যে স্যার ভিতরে ভিতরে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেলেও কিছু করতে পরছেন না। স্যার বুঝে গেছেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদের পক্ষে।

প্রিয়াংকা মেয়েটা বেশ মজার, তার মাথার মাঝে একটা পাগলামোর ভাব আছে। সেদিন ক্লাসে এসে দেখি সে সবাইকে নিয়ে কী একটা 'ষড়যন্ত্র' করছে। ষড়যন্ত্রটা খুব মজার- আজকে নাকী শিউলির জন্মদিন, তাই যখন শিউলী ক্লাসে

আসবে তখন হঠাৎ করে সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠবে, হ্যাপি বার্থডে! শুধু তাই না প্রিয়াংকা আর কয়েকজন মিলে মনে হয় শিউলির জন্যে গিফটও নিয়ে এসেছে! প্রিয়াংকা নিজে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, যখন দেখলো শিউলি আসছে তখন সে ভিতরে ছুটে এসে সবাইকে সাবধান করে দিলো। ক্লাসের সবাই যে যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই খুব স্বাভাবিক ভান করতে লাগলো। শিউলি কিছু জানে না, সে এসে তার ব্যাগ রেখে তার নিজের জায়গায় বসেছে। তখন কথা নাই বার্তা নেই হঠাৎ করে পুরো ক্লাসের সবাই মিলে বিকট সুরে চিৎকার করে উঠল, "হ্যা-পি-বা-র্থ-ডে-শি-উ-লি!"

শিউলি এমন ভাবে চমকে উঠল যে সেটা বলার মতো না। সবগুলি মেয়ে তখন নিজেরা হাত ধরাধরি করে শিউলিকে ঘিরে নাচতে লাগলো আর হ্যাপি বার্থডে গান গাইতে লাগলো! শিউলি চোখ বড় বড় করে সবার দিকে তাকিয়ে থাকে, লজ্জায় মনে হয় সে মরে যাচ্ছে, তার মুখের রঙ লাল নীল বেগুনি হতে থাকে। সবকিছু মিলে পুরো ব্যাপারটা ন্যাকামির চূড়ান্ত, কিন্তু ঠিক কী কারণ জানি না দেখে আমার ভালই লাগলো। শিউলি ক্লাসের সবচেয়ে লাজুক আর চুপচাপ মেয়ে, তার মনে হয় অনেকটা আমার মতো অবস্থা, বন্ধুবান্ধব বেশি নাই। তাকে নিয়ে এতো হৈচৈ সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

গান গাওয়া শেষ হলে প্রিয়াংকা তার ব্যাগ খুলে শিউলির জন্যে একটা গিফটের প্যাকেট বের করলো। তার দেখা দেখি অন্যেরাও। কোনটাতে বই, কোনটাতে মাথার ক্লিপ, কোনটাতে কলম। কয়েকটা ছেলেও দেখি গিফট এনেছে, ছেলেরা মনে হয় গিফট কেনার ব্যাপারে বেশি সুবিধের না, চানাচুর না হয় চিপসের প্যাকেট কিনে এনেছে! শিউলি খুলে বের করা মাত্রই নিজেরাই কেড়ে নিয়ে খুলে সবাই মিলে খাওয়া শুরু করে দিল। আমি এসব হৈচৈ আনন্দ থেকে দূরে থাকি, আজকেও দূরে থেকে দেখলাম। দেখে ভালই লাগলো, মনে হলো সবাই মিলে খুব মজা করছে। প্রিয়াংকা মেয়েটা আসার আগে ছেলেরা আর মেয়েরা মিলে এক সাথে হৈচৈ করছে ব্যাপারটা চিন্তাই করা যেতো না।

বিকাল বেলা স্কুল থেকে বের হয়ে আমি হাঁটছি তখন হঠাৎ কোথা থেকে জানি প্রিয়াংকা ছুটে এসে আমার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোর বাসা কী এদিকে?"

আমি "হ্যাঁ' "না" কিছু না বলে অস্পষ্ট একটা শব্দ করলাম। আমার বাসা কোথায় আমি সেটা কাউকে বলতে চাই না। স্কুল ছুটির পর আমি কোন দিনও বাসায় যাই না। রাস্তায় বের হয়ে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করে যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন চোরের মতো বাসায় ফিরে যাই। প্রিয়াংকা কী বুঝলো কে জানে

নিজের মনে বকবক করতে লাগলো। আমি কোন কথা না বলে তার কথা শুনতে লাগলাম- মেয়েটা নিঃসন্দেহে একটা মজার মেয়ে, এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারে যে শুনতে খুব মজা লাগে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে গেলো। আমি বললাম, "কী হয়েছে?"

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, "ঐ দেখ।"

আমি প্রিয়াংকার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে এমন কিছু অস্বাভাবিক জিনিস দেখতে পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কী দেখব?"

প্রিয়াংকা চাপা স্বরে বলল, "বাচ্চা মেয়েটাকে দেখছিস না?"

আমি তখন ধুলায় ধূসর চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখতে পেলাম। রাস্তার ধুলোয় পা ছড়িয়ে বসে আপন মনে খেলছে। রুক্ষ লাল জটা বাঁধা চুল, ময়লা একটা ফ্রক পরে আছে। প্রিয়াংকা আবার গলা নামিয়ে বলল, "এই মেয়েটাকে খুঁজছি কয়দিন থেকে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন? এই মেয়ে কী করেছে?"

"কিছু করে নাই। মেয়েটার খুব শখ একটা লাল জামার।"

"তুমি কেমন করে জানো?"

"সেইদিন তার মায়ের সাথে বসেছিল তখন দেখেছে একটা ছোট মেয়ে লাল জামা পরে তার আম্মু-আব্বুর সাথে যাচ্ছে। তখন সে তার মাকে বলেছে, মা আমারে একটা লাল জামা কিনে দিবা? তার মা তখন কী করেছে জানিস?"

"কী করেছে?"

"ঠাস করে গালে একটা চড়। চড় দিয়ে বলে পেটের খিদায় জান বাঁচে না, লাল জামার শখ! মেয়ের শখ দেখো!"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা বলল, "এত শক্ত একটা চড় খেয়েও কিন্তু মেয়েটা চোখের পানি ফেলে নাই। মায়ের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল।"

আমি আবার বললাম, "ও!"

প্রিয়াংকা তার ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে বলল, "এই মেয়েটার জন্যে একটা লাল জামা কিনেছি। কয়দিন থেকে মেয়েটাকে খুঁজছি, আজকে পেয়ে গেলাম!"

আমি অবাক হয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রিয়াংকা মুখ টিপে হেসে বলল, "প্যাকেটটা খুলে মেয়েটা যখন দেখবে ভিতরে একটা লাল জামা কী খুশি হবে চিন্তা করতে পারিস?"

মেয়েটা লাল জামাটা পেয়ে কতটুকু খুশি হবে জানি না, কিন্তু লাল জামার প্যাকেটটা দেয়ার জন্যে এই ছোট নোংরা বাচ্চাটাকে দেখে প্রিয়াংকা যে অসম্ভব খুশি হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রিয়াংকা প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকলো, "এই যে, শুনো–"

বাচ্চা মেয়েটা চোখ তুলে তাকালো, মনে হলো একটু ভয়ে ভয়ে।

প্রিয়াংকা বলল, "এই যে নাও। এইটা তোমার জন্যে।"

মেয়েটা একটু ভয়ে ভয়ে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে হঠাৎ বুকে চেপে ধরল, দেখে মনে হলো সে ভয় পাচ্ছে যে কেউ বুঝি তার কাছ থেকে এটা কেড়ে নেবে। প্রিয়াংকা তাকে অভয় দেবার জন্যে একটু হাসলো কিন্তু বাচ্চা মেয়েটা তারপরেও খুব অভয় পেলো বলে মনে হলো না। প্যাকেটটা বুকে চেপে ধরে রেখে বড় বড় চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়াংকা তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টেনে বলল, "আয় যাই।"

আমি নিচু গলায় বললাম, "প্যাকেটটা খুলে কী করে দেখবে না?"

"নাহ্!"

"কেন?"

"আমি সেটা কল্পনা করে দেখে নেব। কল্পনা করে দেখতে আরো বেশি মজা!"

আমি প্রিয়াংকার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "তুমি মাঝে মাঝেই এরকম করো?"

প্রিয়াংকা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমি এটাকে বলি 'বিক্ষিপ্ত ভাবে আনন্দ বিতরণ'। চিনি না জানি না সেরকম মানুষকে হঠাৎ করে কোনভাবে খুশি করে দেওয়া।"

ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অসাধারণ, আমার সুন্দর করে কিছু বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা বলল, "তুই একটা জিনিস জানিস?"

"কী?"

"নিজেকে খুশি করা থেকে অন্যকে খুশি করার মাঝে অনেক বেশি আনন্দ!"

আমি বললাম, "ও।"

প্রিয়াংকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোর সাথে কথা বলে কোন মজা নেই। তুই শুধু একটা শব্দ জানিস– সেটা হচ্ছে 'ও।'"

আমি বোকার মতো আবার বলে ফেললাম, "ও!"

আর সেটা শুনে প্রিয়াংকা হি হি করে হাসতে শুরু করল।

রাত্রিবেলা হঠাৎ খুব একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটলো, আমাকে আব্বু ডেকে পাঠালেন। আমার বুকটা আতংকে ধ্বক করে উঠল, একবার মনে হলো দরজা খুলে পালিয়ে যাই। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে স্টোররুম থেকে বের হয়ে ডাইনিং রুমে এলাম। আব্বু ভাইয়া আর আপুকে নিয়ে খাচ্ছেন, টেবিলে দুলি থালা খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। ইলিশ মাছের বড় বড় পেটি লাল করে ভাজা হয়েছে। একসময় আমার খুব প্রিয় খাবার ছিল ইলিশ মাছ, শেষবার কবে ইলিশ মাছ খেয়েছি মনে করতে পারলাম না। ভাতগুলো কী সুন্দর, চিকন এবং ধবধবে সাদা। ডাইনিং টেবিলে প্লেট-গ্লাসগুলো সুন্দর করে সাজানো, পাশে ন্যাপকিন ভাঁজ করে রাখা।

আব্বু প্লেটে ভাত নিতে নিতে চোখের কোণা দিয়ে আমাকে দেখে মুখ কুঁচকালেন, বললেন, "ছিঃ, তোর গায়ে দেখি বোটকা গন্ধ।"

আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম। আপু আর ভাইয়া কী সুন্দর কাপড় পরে খেতে বসেছে, আর আমি ময়লা খাটো একটা পায়জামার ওপরে একটা ময়লা শার্ট পরে আছি। শরীরে গন্ধ থাকতেই পারে। আব্বু বললেন, "তোর পড়াশোনার কী খবর?"

আমি কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পড়াশোনার অবস্থা একেবারেই ভাল না, অঙ্ক ছাড়া আর কিছু পড়তে ইচ্ছে করে না। সেই অঙ্কেও পরীক্ষায় কোন নম্বর পাই না। স্যাররা যে নিয়মে করতে বলেন সেই নিয়মে না করলে নম্বর দেন না আর যদিও তাদের নিয়মে করি স্যাররা মনে করেন আমি নকল করেছি। প্রথম যখন আব্বু আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছিলেন তখন আমার পুরো জগৎটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, এখন বেশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মেনেই নিয়েছি যে এটাই হবে। তবে পড়াশোনা করাটা অন্য একটা ব্যাপার— কারো মন ভেঙ্গে গেলে পড়াশোনা করতে পারে না। আব্বু স্কুলের বেতনই দিতে চান না, অনেক কষ্ট করে ভাইয়া-আপুকে বলে সেটা জোগাড় করতে হয়। স্কুলের বইও আমার নেই, কিছু পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কিনেছি, কিছু ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়ের কাছে থেকে চুরি করেছি। বইপত্র খাতা কলম না থাকলে মানুষ কেমন করে পড়ে? কাজেই আমি আব্বুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আম্মু ইলিশ মাছের পেটিগুলো ভাইয়া আর আপুর প্লেটে তুলে দিতে দিতে বললেন, "কী হলো? কথার উত্তর দিস না কেন?"

আমি এবারেও কিছু বললাম না, মাথাটা আরো নিচু করে ফেললাম।

আম্মু বললেন, "পড়াশোনা করবি না কিছু না, চুরি-চামারি করে বেড়াবি আর আমি তোর পিছনে টাকা ঢালব সেটা হবে না। বুঝেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম। আম্মু বললেন, "শুনে রাখ, তুই যদি পাস করতে না পারিস তোর পড়াশোনা বন্ধ।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম, সত্যি কথা বলতে কী মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পড়াশোনা যে আমার জন্যে নয় সেটা বেশ কিছুদিন হলো আমি বুঝে গেছি, শুধু সেটার জন্যে কষ্ট করার কোন মানে হয় না। যখন আব্বু বেঁচেছিলেন, যখন সবাই আমাকে আদর করতো তখন আমার কতো রকম স্বপ্ন ছিল। এখন আমার কোন স্বপ্ন নেই, সবচেয়ে বড় কথা সেটা নিয়ে কোন দুঃখও নেই।

আম্মু বললেন, "যা সামনে থেকে।"

আমি সুড়ুৎ করে আমার স্টোররুমে চলে এলাম।

রাত ঠিক দশটার সময় আমার অতিথি চলে এলো, আমি আজকাল নেংটি ইঁদুরটার জন্যে অপেক্ষা করে থাকি। ছোট ছোট লাফ দিয়ে বেশ নির্ভয়ে সে আমার হাতে উঠে কুটুর কুটুর করে তার রুটিটা খেতে শুরু করলো। আমি ফিসফিস করে বললাম, "কী খবর মিচকি মিয়া?"

নেংটি ইঁদুর আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "মিচকি মিয়া। আজকে আমার জন্যে গুড নিউজ। আমার আর পড়াশোনা করতে হবে না! কী মজা, তাই না?"

মিচকি মাথা নাড়লো, পড়াশোনা না করা যে অনেক আনন্দ সেটা সেও স্বীকার করে নিল। আমি বললাম, "তার মানে বুঝেছিস? আমার বাসা থেকে পালানোর সময়টা এসে গেছে। একা একা থাকতে তোর মন খারাপ হবে নাকী?"

মিচকি আবার মাথা নাড়লো, আমি ধরে নিলাম তার মানে হচ্ছে "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মিচকি রুটির প্রথম টুকরোটা শেষ করে দ্বিতীয় টুকরোর জন্যে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে। আমি পকেট থেকে ছোট আরেকটা টুকরো বের করে তাকে ধরিয়ে দিলাম, সে সাথে সাথে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটা খেতে শুরু করলো। এইটুকু একটা প্রাণী কিন্তু তার পেটের সাইজটা মনে হয় খারাপ না।

আমি বললাম, "তুই ইচ্ছে করলে আমার সাথে যেতে পারিস। আমার পকেটে থাকবি। ঘুমাবি। ঘুরে বেড়াবি আমার সাথে। যাবি?"

মিচকি তার খাওয়া নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিল যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশি আগ্রহ দেখালো না।

আমি পরের দিন সকাল এগারোটার সময় বাসা থেকে পালিয়ে গেলাম। সেদিনই যে বাসা থেকে পালাব সেটা আমি আগে থেকে ঠিক করি নাই। দিনটি ছুটির দিন, স্কুল কলেজ অফিস সবকিছু বন্ধ কাজেই সবাই বাসায়। ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি শুনতে পাচ্ছি অন্য সবাই উঠে গেছে, ব্যস্ত গলায় কথা বলতে বলতে ঘরের ভেতরে হাঁটাহাঁটি করছে। ভাইয়া আপু আর আম্মুর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল তারা কোথাও যাবে তাই তাড়াহুড়ো করে রেডি হচ্ছে। সবাই যদি সারাদিনের জন্যে চলে যায় তাহলে খারাপ হয় না, পুরো বাসাটা তাহলে আমি পেয়ে যাব, এই ছোট স্টোররুমের বাইরেও আমি একটু নাড়াচাড়া করতে পারব।

আমি শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছিলাম কখন সবাই বের হয়ে যায়, তখন হঠাৎ ভাইয়ার গলার স্বর শুনতে পেলাম, "তপু, এই তপু।"

আমি একটু চমকে উঠলাম, এই বাসাতেও থাকলেও সবাই এমন ভাব করতো যে আমি আসলে এখানে নেই। আজকে ভাইয়া আমাকে ডাকছে, স্বীকার করে নিচ্ছে যে আমি আসলে এই বাসায় আছি। ব্যাপারটা কী? আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে স্টোররুম থেকে বের হয়ে এলাম। ভাইয়া তার ঘর থেকে আমাকে ডাকছে, আমি সাবধানে ঘরে ঢুকলাম। ভাইয়া বলল, "তপু, দ্যাখ জুতো দুটি কী ময়লা হয়েছে। একটু পরিষ্কার করে দে দেখি।"

ভাইয়া খুব স্বাভাবিক গলায় কথাটা বলল, যেন আমি সবসময় তার জুতো পরিষ্কার করে দিই। এই বাসায় আমার একটা নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে– কাল রাতে আম্মু বলেছেন পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে আমার পড়াশোনা বন্ধ, আজ সকালে ভাইয়া বলছে তার জুতো পরিষ্কার করে দিতে! আমি জুতো জোড়া তুলে নিলাম, একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে মুছে জুতোগুলো পরিষ্কার করে ব্রাশ দিয়ে খুব সুন্দর করে কালি করে দিলাম। আগে কখনো জুতো কালি করি নাই কিন্তু ভবিষ্যতে করতে হবে না সেটা কে বলেছে? একটু প্র্যাকটিস থাকা মন্দ নয়!